Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020899

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020899

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আত্মশুদ্ধি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 228020899 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মশুদ্ধি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Jannatul Ferdus

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 228020899

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কীভাবে অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবো ৬

মুমিনের আত্মাকে শুদ্ধ ও উন্নত করার অভিযাত্রা ৯

ক্বলবুস সালিম ১৩

বিশুদ্ধ হৃদয়ের লক্ষণ ১৮

গাফলতি ও উদাসীনতা ৩০

অহংকার ৩৩

একটি উত্তম দোয়া ৩৬

সবরুন জামিল ৪৮

ইমান , আমল , ইখলাসে গড়া ৫৫

আমার চিরস্থায়ী আবাস... ৫৫

হৃদয়ে আল্লাহর অবস্থান.. ৭৫

আল্লাহর নামে শুরু করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেন— সবাইয়ের ওপর।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন জ্ঞান দিন, যা আমাদের উপকারে আসে, এবং আমাদেরকে সেই জ্ঞান থেকে উপকার দিন, যা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি দোয়া শ্রবণকারী ও দোয়া কবুলকারী।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে, যা উপকারে আসে না; এমন হৃদয় থেকে, যা বিনয়ী নয়; এমন প্রাণ থেকে, যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না; এবং এমন দোয়া থেকে, যা কবুল হয় না।

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যখন আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তখন আমাদের হৃদয়কে বিভ্রান্ত করবেন না। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য দয়া দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরম দাতা।

কীভাবে অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবো

হৃদয় হচ্ছে একটি স্ফটিক ফুলদানি — একটি উজ্জ্বল, দৃষ্টিনন্দন স্ফটিক ফুলদানি, যা আল্লাহ তৈরি করেছেন। কিন্তু যখন আমরা জীবন যাপন করি, তখন এটি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিছুটা ময়লা ধরে, আরও ময়লা ধরে, আরও ময়লা ধরে এবং কখনও কখনও একেবারে কালো হয়ে যায়।

এই ময়লাগুলো কী?

রাগ, হিংসা, মিথ্যা বলা, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, আসক্তি, প্রতিযোগিতা — 'আমি সবার চেয়ে ভালো হবো', আমি তাদের হার মানাবো', ব্যবসায় প্রতিযোগিতা, চোগলখুরি করা, এসবই আসলে পাপ।

শরীরের মতোই হৃদয়ও পাপের মাধ্যমে নোংরা হয়।

তাহলে, পবিত্রতা (তাজকিয়াহ) কী করে?

এটি একটি প্রক্রিয়া। সহজভাবে বললে: সেই স্ফটিকটি, যা সময়ের সাথে নোংরা হয়ে গিয়েছিল, সেটিকে পরিষ্কার করা হয়। পলিশ করা হয়। এবং এটি আবার তার মূল উজ্জ্বল অবস্থায় ফিরে আসে। ফোকাস হলো আমি এখানে আছি আল্লাহর খলীফা হিসেবে। আমি এই পৃথিবীতে প্রতিনিধি।এটি এখন আমরা সবাই বুঝতে শুরু করেছি।

এখানেই চিকিৎসার ধারণাটাও চলে আসে।

যেমন ধরুন, যদি আপনার শরীরে একটি ক্ষত হয় এবং তা ইনফেক্টেড হয় — প্রথম কাজ কী করবেন?

ক্ষতটিকে পরিষ্কার করবেন। তারপরে চারপাশের এমন সবকিছু সরিয়ে দেবেন যা আবার ক্ষতকে ইনফেক্টেড করতে পারে। তারপর এমন কিছু প্রয়োগ করবেন যা ক্ষতকে সুস্থ হতে সাহায্য করবে। এটাই হচ্ছে তাজকিয়াহ বা হৃদয় পরিশুদ্ধ করা।

আমাদের হৃদয়ও ক্ষতবিক্ষত — হিংসা, চোগলখুরি, ঘৃণা, ঈমানের দুর্বলতা ইত্যাদি দ্বারা।তাহলে আস্তে আস্তে এগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। হৃদয় থেকে এগুলো দূর করতে হবে। ধুতে হবে।

হৃদয় পরিশুদ্ধ করা (তাজকিয়াহ) হচ্ছে তিনটি প্রধান মিশনের একটি, যার জন্য আল্লাহ প্রিয় নবী ﷺ কে প্রেরণ করেছিলেন।

কোরআনে বলা হয়েছে:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি তাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের আত্মাকে পবিত্র করবেন।"

(সূরা বাকারা ২:১২৯)

এখানে ৩টি বিষয় বলা হয়েছে —

১. আয়াত পাঠ করা|

২. শিক্ষা দেওয়া|

৩. আত্মাকে পবিত্র করা।

তাজকিয়াহ হল ফরজ আইন| প্রতিটি ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক। এবং এটি একটি ধাপে ধাপে চলার প্রক্রিয়া| একদিনে হবে না। এটি কোরআন মুখস্থ করার মতো — ধৈর্য লাগবে।

তাহলে, সংক্ষেপে, করণীয় কী?

প্রথম ধাপ: নিজের সমস্যা চিহ্নিত করা। আমার সমস্যা কী? রাগ? রাগলে আল্লাহর অবাধ্যতা করি? মানুষকে কষ্ট দিই? হিংসা? অন্যের কাছে যা আছে, তা আমি চাই? মনে করি সে তা পাওয়ার যোগ্য নয়?

মিথ্যা বলা? কারো সম্মান নষ্ট করা? এসব জানতে হবে। তারপর এক এক করে এসব দূর করা।

যেমন: আমি বুঝি আমার বন্ধুরা গীবত করে, তাহলে তাদের থেকে দূরে থাকা দরকার। আমি বুঝি নির্দিষ্ট কোনো কাজ বা পরিবেশ আমাকে রাগান্বিত করে, তাহলে তা এড়িয়ে চলা উচিত। কোনো বিশেষ মানুষের সাথে মিশলে মনে হিংসা জন্মায় — তাহলে সেই সামাজিক মেলামেশা কমিয়ে দিতে হবে।

✓ জ্ঞান অর্জন করতে হবে — আল্লাহ সম্পর্কে, নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে হবে।

✓ মুজাহাদা (সংগ্রাম) করতে হবে — নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই।

✓ ৪টি কাজ কমাতে হবে এবং ১টি কাজ বাড়াতে হবে:

১. কম খাওয়া|

২. কম ঘুমানো|

৩. কম কথা বলা|

৪. কম মানুষের সাথে মেলামেশা করা

এবং,

৫. বেশি আল্লাহর জিকির করা।

জিকির হলো হৃদয় পরিষ্কারের মূল উপায়।যেমন– কোরআন পড়া, মুখস্থ করা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, সকালে-সন্ধ্যায় যিকির করা , সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে আল্লাহর প্রশংসা করা — এসবই জিকির।

এটি ধীরে ধীরে পরিবর্তন নিয়ে আসে। মানুষ আরও শান্ত হয়, আরও কৃতজ্ঞ হয়। কম অভিযোগ করে, কম দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত, মানুষ আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করে। কুরআন শুনলে বা পড়লে চোখে পানি আসে, রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়ানো সহজ হয়।

মুমিনের আত্মাকে শুদ্ধ ও উন্নত করার অভিযাত্রা

আত্মশুদ্ধি বা 'তাযকিয়াতুন নাফস' (নফসের পরিশুদ্ধি) — এগুলো সবই আমার এবং আমার রবের (আল্লাহর) মাঝে সম্পর্ক ঠিক করার জন্য। এর সাথে অন্য কারো কোনো সম্পর্ক নেই — না আমার সন্তান, না আমার স্বামী, না আমার বন্ধু। এবং মনে রাখবেন, কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর সামনে একা দাঁড়াবো। কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না, কেউ আমার পক্ষ নেবে না।

আর কেউ যদি আমার চেয়ে খারাপ হয়, তাতে আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। কেউ যদি আমার চেয়ে ভালো হয়, তবুও আমার অবস্থা আল্লাহর কাছে পরিবর্তিন হবে না।

তাযকিয়াতুন নাফস মানে হলো: "আমি ও আমার রবের সম্পর্ক কেমন?" এটাই মূল বিষয়।

এখন থেকে যখন নেতিবাচক কিছু আসবে, মনে মনে সবসময় বলবেন: "হ্যাঁ, এটা আমারই সমস্যা।" কখনো বলবেন না: "না, এটা আমার নয়।"

আমরা নিজেদের প্রশংসা করতে পছন্দ করি। কিন্তু আমাদের প্রশংসা করার ধরন সবসময় সরাসরি হয় না| অনেক সময় আমরা পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রশংসা করি। যেমন: মায়েরা যখন তাদের সন্তানের প্রশংসা চান, মূলত তারা নিজেরাই প্রশংসা পেতে চান। যখন আপনি বলেন: "আমার মেয়ে অক্সফোর্ড্রে ভর্তি হয়েছে, আসলে আপনি নিজেকেই সম্মানিত দেখাতে চান। এটি আমাদের স্বভাব, আমরা প্রশংসা চাই, খুশি হই যখন প্রশংসা পাই এবং কষ্ট পাই যখন প্রশংসা পাই না। এটাই বদলাতে হবে।

❁ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

"তোমরা নিজেদের প্রশংসা করো না; তিনিই ভালো জানেন কে প্রকৃত পরিশুদ্ধ।" (সূরা আন-নাজম ৫৩:৩২)

প্রকৃত পরিচয় আল্লাহ জানেন। নিজেকে কখনো প্রশংসা করবেন না।

এমনকি বাহ্যিকভাবে চুপচাপ থাকলেও, যদি মন থেকে কষ্ট পান যখন কেউ আপনাকে প্রশংসা করে না — তাহলে আপনার হৃদয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। এটা স্বামী, সন্তান, বা যে-ই হোক না কেন, সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আপনার আসল চাওয়া হওয়া উচিত: "আমার রব যেন আমাকে প্রশংসা করেন।"

মানুষের প্রশংসা কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। হাজার হাজার মানুষ যদি আমাকে প্রশংসা করে, কিন্তু আল্লাহ যদি আমাকে না চান — তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। আমাদের ফোকাস হতে হবে: আল্লাহ আমার সম্পর্কে কী ভাবছেন? মানুষের নয়। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে, আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের মন রক্ষা করতে কাজ করি, মানুষকে ইমপ্রেস করতে চাই। আমরা কষ্ট পাই: সে বললো না, সে প্রশংসা করলো না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কী করছি? সেটাই মূল বিষয়। শুদ্ধ হৃদয় হলো সে হৃদয় যার ফোকাস শুধু আল্লাহর উপর — মানুষের উপর নয়।

আমি জানি না আল্লাহ আমার সম্পর্কে কী ভাবেন, তাই আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব এবং আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো এবং বলবো, 'আমি চেষ্টা করছি।' আমি এটা বলবো না যে, 'আমি তো সারা জীবন এভাবেই চলবো, আল্লাহ তো মহা মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।' না, আমি আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হবো না। কারণ যদি আমি এভাবে চলি, তাহলে আল্লাহর কাছে হয়তো B- নিয়ে উপস্থিত হবো। আমি কি আল্লাহর কাছে বি মাইনাস নিয়ে যেতে চাই? কেউ কি চায় যে কোথাও মাইনাস গ্রেড নিয়ে পৌঁছাতে? ধরুন আপনি কিছু রান্না করলেন, তারপর কেউ যদি আপনার রান্নাকে B- দেয়, আপনি কি খুশি হবেন? না, আমরা সবাই চাই সর্বোচ্চ A+ গ্রেড। তাহলে কেন আল্লাহর ব্যাপারে এমন চাইবো না?

আপনাকে যদি কোনো দাওয়াতে, বিয়েতে, গ্র্যাজুয়েশনের অনুষ্ঠানে বা কোনো বড় সমাবেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন কি আপনি অনেক সময় ব্যয় করেন না নিজেকে সাজাতে, আপনি চান সবাই দেখুক আপনি সুন্দর ও পরিপাটি। ঠিক তেমনি আপনাকে ভাবতে হবে — 'আমি কিভাবে আল্লাহর সামনে যাবো?'

কারণ আমরা সবাই একদিন আল্লাহর কাছে যাবো, চাইলেও না চাইলেও। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে একা একা উপস্থিত হবে।'

ঠিক যেভাবে আমরা দুনিয়ায় জন্মেছিলাম — একা, শিশুর মতো।

প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই দিনের জন্য প্রস্তুত?

সবাই যখন কোনো ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি নেয়, তখন কি আগের দিন দুশ্চিন্তায় পড়ে না? যদি সেই দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠতে চাও, তাহলে ভাবো, 'আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি' এখন তুমি যাকে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছো, তারা তো তোমার মতোই

মানুষ। তারা কাউকে উপকার বা অপকার করতে পারে না যদি না আল্লাহ অনুমতি দেন।

এটা হাদিসে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন ছোট ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন:

"জেনে রাখো, যদি সমগ্র জাতি তোমাকে উপকার করতে চায়, তারা কিছুই করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ তা নির্ধারণ করে দেন।"

তাহলে আমরা কেন মানুষের নিয়ে এত চিন্তা করি? মানুষ কী বললো, কে কী ভাবলো, কে আমাকে পেছনে গালি দিল — এতে কী আসে যায়? বরং যদি কেউ আমার গীবত করে, তাহলে সে আসলে আমাকে নিজের নেক আমল উপহার দিচ্ছে! আমি বলি, "ধন্যবাদ, চালিয়ে যান!" — কারণ তারা তাদের নেক আমল আমার দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনোভাব সাধারণত এমন হয় না, কারণ আমরা 'নিজেকে' নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকি। আমাদের অহংকার — 'কীভাবে সে এটা বললো? সে কি জানে না আমি কে?' এই মনোভাব আমাদের বদলাতে হবে।

সুতরাং আমাদের চাওয়া উচিত: 'হে আল্লাহ! আমাকে অবাধ্যতার পথে চলতে দিও না। আমাকে সেই ব্যক্তি বানাও, যার কাজগুলো তুমি পছন্দ করো।'

তারপর কুরআনে বলা হয়েছে — কেয়ামতের দিন, কোনো সম্পদ বা সন্তান আপনার উপকারে আসবে না। শুধু নিঃশর্ত পরহেযগারতা (তাকওয়া) কাজে আসবে।

আল্লাহ কেন কেবল 'সম্পদ' এবং 'সন্তান' বললেন? কেন 'স্বামী' বা 'পিতা-মাতা' বললেন না? কারণ, অধিকাংশ সময় আমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করি এই দুই বস্তু — ধন-সম্পদ ও সন্তান — এর জন্য। কারণ এগুলোই দুনিয়ার শোভা এবং অহংকারের বস্তু।

আল্লাহও বলেছেন:

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।"

যখন কিছু মানুষ তাদের জন্মদিন উদযাপন করে তাদের আমি একটি প্রশ্ন করি, আমি কখনও বলি না যে এটা হারাম বা হালাল| সব কিছুই হারাম এবং হালাল, হারাম এবং হালাল একপাশে রাখুন। এখন আমি আপনাকে শুধু আপনার মাথা ব্যবহার করতে বলছি। আমরা আসলে কি উদযাপন করছি? সত্যিই, আমি চাই আপনি এটা গভীরভাবে ভাবুন। যখন কেউ একটি বড় কেক নিয়ে আসে, এবং বয়সের সাথে সাথে তারা কোনো সংখ্যা রাখে না, তখন আমরা জানি এটা শুধু এক সত্য — এক বছরে আমরা মৃত্যুi কাছে আরও কাছাকাছি চলে আসলাম। এটা কি এমন একটি মুহূর্ত, যা উদযাপন করার

মতো? তাই হালাল এবং হারাম বাদ দিয়ে আমি শুধু আপনাকে বলতে চাই, যখন আমরা সেখানে পৌঁছাবো, বা নববর্ষের সময়, যেমন আমাদের ইংরেজি নতুন বছর বা ইসলামী নতুন বছর, এই মুহূর্তগুলো আমাদের জন্য উচিত চিন্তা-ভাবনা করার মুহূর্ত হওয়া। আপনি ২৫ বছর বয়সে ২৬ বছরে চলে এসেছেন, গত ২৫ বছরে আপনি কী করেছেন? ধরুন, আপনি যখন শিশু ছিলেন, তাহলে ১৫ বছর বয়স থেকে ২৫ পর্যন্ত কী করেছেন? তাই এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা মুসলিম হিসেবে এই দ্রুত চলতে থাকা দুনিয়াতে কখনো ভুলে না যাই, যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা সবাই জানি, মৃত্যু এড়িয়ে চলতে পারবো না। এটা আসবেই, একদিন, আমরা সবাই যাবো। কেউ বেঁচে থাকবে না, যদি কেউ না মারা যেত, তবে তা হবে, আল্লাহর কোনো রসুল। ভাবুন, এই আয়াতটি যখন পড়ি, কতবার মনে হয়: "ইয়া আল্লাহ, আমি যখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছি, তখন আমি কেমন অনুভব করব?" আল্লাহ বলেছেন, "কারোও এখানে স্থায়ী বসবাস নেই, সবাই চলে যাবে।" আমাদের জীবনের সব কিছুই সাময়িক। আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ যা চায় তা পালন করা, কারণ আমরা এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি। কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক রকম বিভ্রান্তি বা একে আমি বলি 'বিভ্রান্তি', কিন্তু এসবের মাঝে আমি কি নিজেকে বারবার যাচাই করছি? আমি কি সেই জায়গায় আছি যেখানে আমি আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, আমার জীবনের এখন পর্যন্ত কী করেছি, আমার আল্লাহর পথে চলার জন্য? কতটা সম্পদ করেছি, কজন সন্তান পেয়েছি, বড় বাড়ি করেছি, এসব বিষয় কিছুই আল্লাহর কাছে কাজে আসবে না। এইসব কিছুই অন্য কাউকে দেওয়া হবে, কিন্তু আমি নিজের জন্য কি করেছি?

আমি সব সময় এসব চিন্তা করি, কারণ এটা আমাকে সজাগ রাখে। যদি আল্লাহ বলেন, 'তুমি নিজের বই নিয়ে এসো, এটা আমি তোমাকে রিভিউ করতে দিচ্ছি', যদি আল্লাহ আমার বই আমাকে দিতেন, তখন আমি কী দেখব সেখানে? আমি নিজেই আমার কাজগুলো মূল্যায়ন করতে পারব। আমি কি কুরআনের সেই শিক্ষা অর্জন করেছি, যা আল্লাহ আমাকে শেখাতে চান? আমি কি রমযান শেষ করার পর নিজের কাজগুলো মূল্যায়ন করেছি?

ক্বলবুস সালিম

আল্লাহ ইবরাহিম (আঃ)-কে আল্লাহ বলেছিলেন, "সে আমার কাছে একটি পরিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে এসেছিল।" পরিশুদ্ধ হৃদয় বা 'সলিম' হৃদয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সকল ভালো কাজের ভিত্তি।"

অনেকে বলেন, 'পবিত্র হৃদয়' এবং কিছু কিছু আলেম বলেন, 'সুস্থ হৃদয়|

আমরা যে হৃদয়ে আল্লাহকে ছাড়া কিছু ধারণ করি না, সেটা হলো পবিত্র হৃদয়। আপনি মানুষকে ভালোবাসেন, কিন্তু তারা আপনার হৃদয়ে বসবাস করে না। আপনি আপনার কাজ ভালোবাসেন, কিন্তু এটা আপনার হৃদয়ে থাকে না। আপনি আপনার সৌন্দর্য ভালোবাসেন, কিন্তু এটা আপনার হৃদয়ে থাকে না।"

কীভাবে বুঝব, তারা আমার হৃদয়ে থাকে না? যখন আপনি আপনার কাজ হারান, তখন কী হয়? যখন সেই মানুষটি আপনাকে ছেড়ে চলে যায়, যাকে আপনি ভালোবাসতেন, তখন কী হয়? আপনি দুঃখিত বা বিষণ্ণ হয়ে যাবেন, এমনকি আতঙ্কিতও হতে পারেন।"

"এইসব যদি হয়, তবে তারা আপনার হৃদয়ে বসবাস করছিল, এবং আল্লাহ তাদের আপনার হৃদয় থেকে বের করে দিচ্ছেন। যদি আপনি বলেন , 'এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা ঘটবে তাই হবে,' তবে কিছুই পরিবর্তন হবে না।"

আমরা কি কখনো সত্যিই নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে চিন্তা করি? আমাদের হৃদয়ে কেবল আল্লাহর জন্য প্রেম এবং শ্রদ্ধা থাকা উচিত, এবং অন্য কিছু নয়।"

যদি আপনি কর্মের মাধ্যমে জানতে চান, তাহলে ইব্রাহীমের গল্প পড়ুন, যখন তিনি তার বাবার কাছে গিয়েছিলেন, যা একটি বিখ্যাত সংলাপ, আপনারা সবাই জানেন এটি কোথায় রয়েছে, কি আল্লাহ বলেছেন| অনেকভাবে, কিন্তু এখানে তিনি বলেছেন, 'এটি তাদের কাছে বর্ণনা করুন,' ইব্রাহীম তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং ছিলেন নেককার| এখন আপনি ইব্রাহীমকে নিয়ে ভাববেন না, কিন্তু এই ধারণাটির সম্পর্কে ভাবুন। এটি যখন আপনি কুরআন পড়েন এবং কুরআনকে জীবনে প্রয়োগ করেন, তখন এটিই তার অর্থ।"

"তাদের বললেন, 'বাবা,' তিনি বললেন, এবং যারা জানেন, এটি আরবি ভাষায় খুবই আলাদা, 'বাবা' বলার চেয়ে এটি 'আব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ করে। এটি এমন এক শব্দ, যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে সত্যিই ভালোবাসেন। 'এটা পূজো করবেন না,' বুঝিয়ে বলুন, কোনো রাগ নয়, 'আপনি ভুল করছেন না,' কোনো অপমান নেই, 'সবচেয়ে দয়ালু' বললেন, এবং তিনি আল্লাহর নাম ব্যবহার করেননি, এটি একটি আলাদা গল্প। তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে কেন বলছি এটা? বাবা, আমাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আমি যা জানি আপনি তা জানেন না, তাই আমাকে

অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সোজা পথে নিয়ে যাবো।' তিনবার তিনি বললেন, 'আমি আপনার জন্য চিন্তা করছি,' এটা হলো ভালোবাসা, 'আমি চিন্তা করছি আপনি দয়ালু থেকে বিপদে পড়বেন।' কত সুন্দরভাবে তিনি বললেন, খুবই নম্র ও সঠিক, কোনো অবমাননা ছাড়া।"

"তারপর তার বাবা কী বললেন? 'তুমি আমাকে বলতে চাইছো, তুমি যা পূজো করছো তা আমি করব ? এটাই তিনি বলেছিলেন। এটা এক ধরনের প্রশ্ন ছিল, যেমন 'তুমি এটা কীভাবে করতে পারো?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে বের করে দেবো, তোমাকে এখান থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবো, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।' তখন ইব্রাহীম কী বললেন? 'السلام عليكم', আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। কেউ যদি আপনাকে এসব ধরনের অজুহাত দেয়, আপনি কী করবেন? আপনি ' السلام عليكم' বলবেন, এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইবেন, কতজন এটি করবেন? এবং সাধারণত আমরা কী করি? বা আমরা অপেক্ষা করি, দেখি আমি কী করব, তুমি জানো না আমি কে! এই মানসিকতা সাধারণ করি।

"এখানে আল্লাহ কি বলছেন? 'আপনার হৃদয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ থাকবে, অন্য কিছু নয়।' এর মানে হলো, আমি যা কিছু করি, তা আল্লাহর জন্য। আমি মানুষকে দেখি না, আমি আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখি, এটাই বড় পার্থক্য।

এখন, আল্লাহ আপনাকে এক বার্তা পাঠাচ্ছেন, 'জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।' কিন্তু জানেন কি, একদিন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছিলেন, 'জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তোমরা যা কিছু করেছো, তা থেকে কোনো একজনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল ﷺ বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব? আপনি কি জানেন, আমরা কি কিছু করি না? রাসূল ﷺ বললেন- না, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না| আমিও না , যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর দয়া না করেন। এরপর স্কলাররা আলোচনা করলেন, জান্নাতে আমরা কীভাবে প্রবেশ করব, আমাদের অবস্থান কী হবে, আল্লাহ কীভাবে আমাদের গ্রহণ করবেন।

এটি আমাদের জন্য এক মহান বার্তা, কেননা জান্নাতে যা কিছু রয়েছে, তা এমন কিছু যা আগে কোনো চোখ দেখেনি, এবং কোনো কানে শোনা হয়নি। সেখানে প্রবেশ করতে, আল্লাহর দয়া ছাড়া কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

এটি হচ্ছে 'পবিত্র হৃদয় যা কোনো ইচ্ছা থেকে মুক্ত, একেবারে শূন্য, কোনো অন্যকিছু নেই। এটি অর্থাৎ কোনো প্রকারের দুনিয়ার প্রেম বা আকাঙ্ক্ষা নেই, যার বিরুদ্ধে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এই পবিত্র হৃদয়ে কিছু থাকে না, শুধুমাত্র আল্লাহর প্রেম থাকে।

যখন আমার আল্লাহর অবাধ্যতার যুক্তি খুঁজতে চেষ্টা করি– আপনাদের একটা সহজ উদাহরণ দিই। একই ঘটনা ঘটে যখন আমি ফজরের জন্য উঠতে চাই, আবার একইরকম অনুভূতি হয় যখন আমি কারো উপর খুব রাগান্বিত হই এবং মনে হয় কিছু বলব, তখন মন থেকে আওয়াজ আসে: 'বলোনা, এটা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে না।' এভাবে নিজের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে, এগুলো সব শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।

আমি চাই, আপনারা সবাই একা একা সময় নিয়ে সঠিক হৃদয়ের গুণাবলী লিখুন এবং তা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে দেখুন। তারপর লক্ষ্য করুন, কতবার ব্যর্থ হোন এবং কতবার সফল। কারণ এটি একটি প্রক্রিয়া। আজ শুনলেন আর কাল থেকেই আপনি পূর্ণরূপে নেক হয়ে গেলেন — তা হবে না। এটা কঠিন সংগ্রাম। প্রথমত কারণ, আমরা জানি না| দ্বিতীয়ত, কারণ জানা সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় বাধা নিজের 'নফস'।

সবসময় অন্যদের দোষ দেবেন না। আমরা সবসময় অন্যের দোষ দেই। আসলে প্রথমেই নিজের দোষ খুঁজতে হবে। আমাদের সমাজে সবসময় দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো হয়| 'আমি ফেল করেছি কারণ শিক্ষক আমাকে পছন্দ করে না।' অথচ বলা উচিত, আমি ভালোভাবে পড়িনি' বা 'আমি পড়েছি কিন্তু আল্লাহ চাননি আমি পাস করি।' তাই প্রথম কাজ হলো হৃদয়কে মুক্ত করা। মুক্ত মানে — কোনো খারাপ আকাঙ্ক্ষা যেন মনে না থাকে, বিশেষ করে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আরও কঠিন — বিশেষ করে পশ্চিমা সমাজে, যেখানে শিক্ষিত হওয়া মানে নিজের যুক্তিকে বড় করে দেখা হয়। প্রত্যেকটি চিন্তা যা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে যায়, তা বর্জন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ — নারীরা যখন বলে, হিজাব কুরআনে নেই' — এটা ভুল যুক্তি। কারণ কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'তাদেরকে বলুন বুক ঢেকে রাখতে।' (সূরা নূর, আয়াত ৩১)। যেমন শর্টস বললে স্বাভাবিকভাবেই বোঝায় যে শরীরের কিছু অংশ ঢেকে থাকে। তেমনি, আল্লাহ যখন বলেন আরও ঢেকে রাখো, তখন তা আরও বেশিসংখ্যক শরীরের অংশ ঢাকার নির্দেশ।

হিজাব পরা সহজ নয়, এটা সত্যি কথা। যদি কেউ বলে সহজ, তাহলে হয় তারা এখনও শুরু করেনি অথবা আল্লাহ তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। বাস্তবে এটা নিজের প্রবৃত্তি (নফস) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। নিজের মন বলে, আমি সুন্দর দেখতে চাই', শয়তানও একই কথা বলে। তাই যখন কোনো আদেশ আসে, আর আমরা তা অস্বীকার করি, তা আসলে আল্লাহর বিরুদ্ধে চিন্তা।

কখনও কারও সাথে বিতর্কে গিয়ে বলবেন না, আমি নিশ্চিত নই এটা আল্লাহর কথা কিনা', যখন আপনি নিজের ধর্মীয় জ্ঞানেই দুর্বল। এর বদলে বলা উচিত, আমি জানি

এটা ফরজ, আল্লাহ আমাকে সহজ করে দিন।' এই ধরণের মানুষদের সম্মান করা উচিত। কিন্তু যারা যুক্তি দেয়, আমি জানি না , তাদের পরিবর্তন কঠিন।

আমরা যখন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত, সফল, শিক্ষিত হয়ে যাই, তখন অহংকার বেড়ে যায়। তখন নিজের নফসের বিরুদ্ধে যাওয়া সবচেয়ে কঠিন হয়ে পড়ে। এখন নিজের অনুভূতি দেখুন: 'আমি কী চাই? যদি আমার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মেলে, তাহলে সেটা ঠিক। যদি আমার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সেটা সংশোধন করতে হবে।

একটি সত্যিকার মুক্ত হৃদয় শুধু আল্লাহর দাসত্ব করে। আমরা আজ দাসত্ব করি মানুষের কথা, ফ্যাশনের, খাবারের, ঘুমের, সোশ্যাল মিডিয়ার। কিন্তু যখন হৃদয় শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হয়, তখনই প্রকৃত দাসত্ব আসে। প্রকৃত দাসত্ব মানে — 'হ্যাঁ, আল্লাহ', কোনো প্রশ্ন ছাড়া।

আমাদের অনুভূতিগুলোও আল্লাহর জন্য হতে হবে। ভালোবাসা, ভয়, আশা, নির্ভরতা — সবকিছু শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ বলেন: 'আমার কোনো শরিকের প্রয়োজন নেই।' যদি কারো মনে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর নির্ভরতা আসে, আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেন। এবং যাকে প্রাধান্য দাও, তার মাধ্যমেই তুমি কষ্ট পাবে।

উদাহরণ: মা ও সন্তান। অনেক মা সন্তানের ভালোবাসায় আল্লাহর বিধান ভেঙে ফেলে। তখন সেই সন্তানই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আরও উদাহরণ: কেউ চাকরির ভয়ে হিজাব পরেন না। কিন্তু এই চাকরিই পরে তার জন্য কষ্টের কারণ হয়। অথচ যদি হিজাব পরে বলতেন, আল্লাহই আমার রিজিকের মালিক', তাহলে শান্তি পেতেন।

সত্যিকারের সচ্চরিত্র হৃদয় হলো — যে হৃদয় সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভর করে।

আমরা দুনিয়াতে ফোকাস করি: নতুন ফোন, নতুন গাড়ি, নতুন বাড়ি। অথচ তাদের ফোকাস ছিল একটাই — আল্লাহ।

কেউ সমালোচনা করলে রাগবেন না। বরং বলুন: 'আল্লাহ, আপনি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন।' এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কতা।

একটি সচ্চরিত্র হৃদয় গঠন করা কঠিন, কিন্তু অপরিহার্য। কারণ এর মাধ্যমেই আমরা সত্যিকারের মুসলিম হতে পারবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহায়তা করুন। আমিন।

যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন অভিজ্ঞতায়, সব কিছুতে শেখার বার্তা থাকে। আল্লাহ আমাদের যে কোন পথে নিয়ে যান, সেই পথের মধ্যে কিছু শিক্ষা থাকে। সুতরাং, প্রশ্ন হল, আমি কি সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছি? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমি এর থেকে কি শিখেছি? জীবনের যে কোন কঠিন কাজ, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি সেটা করতে পারবেন না, সেটা ভুল। যদি আল্লাহ কোন একজন মানুষকে সেটা করতে দেন, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন। তার মধ্যে শুধু পার্থক্য হল, এটা আপনার জন্য কতটা সহজ বা কঠিন হবে। তবে পুরস্কার কি? পুরস্কার আপনার প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করবে।

আল্লাহ আমাদের কাজের ফলাফলের জন্য নয়, বরং আমাদের প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করবেন। এই জীবনে যদি আপনি জ্ঞান অর্জন করতে চান, আল্লাহ আপনাকে সেই প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করবেন না যে আপনি পিএইচডি অর্জন করেছেন। আল্লাহ কেবল আপনার প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করেন।

এটি হলো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সুতরাং যদি আপনার জীবনে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে, মনে রাখবেন, আল্লাহ কখনোই আপনাকে ত্যাগ করেননি, আপনি যতবার তাকে অমান্য করেছেন, তিনি কখনোই আপনাকে ছেড়ে যাননি। তিনি আপনাকে সুযোগ দিয়েছেন ফিরে আসার জন্য, তাই আপনি কখনোই আল্লাহকে ভুলে যাবেন না।

এটা একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা আমি শিখেছি, এবং তা হল, কিছু করা অসম্ভব নয়, আল্লাহ চাইলে সব কিছু সম্ভব। যখন আমি খুব গরম অনুভব করি, তখন আমি নিজেকে মনে করিয়ে দি একটি কুরআনের আয়াত যা গরমে যাওয়ার সময় মনে রাখা উচিত। এটি হিপোক্রেটদের কথা, যারা গরমের সময় যুদ্ধ করতে যেতে চায়নি। তারা বলেছিল, "এত গরম, বাইরে যেয়ো না," তখন আল্লাহ বলেন, "তাদের বল, যে আগুনের তাপমাত্রা এই গরমের থেকে অনেক বেশি," এটি সব সময় মনে রাখবেন, এটি আপনার সাথে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসবে আল্লাহকে, আপনাকে আল্লাহর সাথে গভীরভাবে ভাবতে সাহায্য করবে।

বিশুদ্ধ হৃদয়ের লক্ষণ

আল্লাহ আমাদের কখনোই ত্যাগ করেননি, আপনি কি কখনো একে অপরকে দেখেছেন, যখন আমরা আল্লাহকে অমান্য করেছি, তখন তিনি কখনোই আমাদের ত্যাগ করেন না। তিনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য একে অপরকে সাহায্য করেছেন, যাতে আমরা ফিরে আসতে পারি।

এটি হল যে, যখন আমরা কাজ শুরু করি, আমরা একটি বিশুদ্ধ হৃদয় অর্জন করতে চাই, আমাদের প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন হবে। আল্লাহ আমাদের কাজের ফলাফলের জন্য নয়, বরং আমাদের প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করেন। যদি আপনি কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চান, কিন্তু সেখানে বাধা থাকে, মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা হবে।

যখন আপনি শুরু করবেন, আপনার পথ সোজা থাকবে না, তবে আপনি যখন সত্যিই চেষ্টা করবেন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। এই সমস্ত কিছুই আপনার জীবনের যাত্রার অংশ। এটাই এই পৃথিবীর জীবনের মূল শিক্ষা। যদি আপনি নিজের জন্য, নিজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য কিছু করতে চান, তবে এটি অবশ্যই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে। এটি কখনোই অসৎ বা হারাম কাজ হতে পারে না। আমাদের উদ্দেশ্য বা নিয়ত যদি সঠিক না হয়, তবে সে কাজটি কখনোই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে পারে না। এটি এমন এক শিক্ষা যা আমরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। আপনার প্রতিটি কাজের জন্য নিয়ত থাকতে হবে, এবং তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এটি যদি আপনvর জন্য কঠিন মনে হয়, তবে আল্লাহর সাহায্যে আপনি তা অর্জন করতে পারবেন।

সবশেষে, যদি কোনো পরিস্থিতিতে আপনি হতাশ হন বা কিছু ঘটলে আপনার মন খারাপ হয়, তখন মনে রাখবেন, আল্লাহ যা চান, সেটাই হবে। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন আপনার প্রচেষ্টা এবং কষ্টের জন্য, ফলাফল যতই হোক না কেন। এই ধারণা তোমার জীবন পরিবর্তন করে দেবে। তুমি অভিযোগ করা এবং দোষারোপ করা বন্ধ করবে। তুমি জানো, দোষারোপের খেলা, আমরা এতে কতটা দক্ষ! সবসময় অন্য কারও দোষ। এখানে ৪ টি লক্ষণ আছে, সবগুলো আমাদের মধ্যে নেই হয়তো।

সুতরাং,

প্রথম লক্ষণ–তোমার ফোকাস| যখন তুমি সকালে উঠো, সন্ধ্যায় ঘুমাতে যাও—সবসময় তুমি যা দেখছো, তুমি তোমার পরকালের জায়গা দেখছো। তুমি তোমার পরকালের স্থান দেখছো।

কেন তুমি বিয়ে করতে চাও? কেন তুমি সন্তান নিতে চাও? কেন তুমি ক্যারিয়ার করতে চাও? কেন তুমি ধনী হতে চাও? এইসব দৈনন্দিন প্রশ্ন আমরা নিজেরাও করি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও শেখাই।

উত্তর হওয়া উচিত: আমার দ্বীনের জন্য। আমি ধনী হতে চাই—কেন? আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ বলবে ভালো জীবনযাপনের জন্য। না! বরং যাতে আমি আল্লাহকে আরও ভালোভাবে ইবাদত করতে পারি।

এটা তোমার উত্তর হওয়া উচিত। রাসূল (স.) আমাদের খুব ভালো করে জানতেন, আর তিনি বলেছিলেন: যার ফোকাস হবে দুনিয়া, তার কী হবে? তার চিন্তা-ভাবনা কখনো শেষ হবে না।

তুমি একটা লোকের দিকে তাকিয়ে বলবে, "আজ তোমার কী হয়েছে?" সে বলবে, "তুমি জানো না, আমার কত কিছু চিন্তার বিষয় আছে। তালিকাটা শেষ হয় না। তালিকা শেষ করতে করতে তালিকা বড় হয়। কারণ ফোকাস হলো দুনিয়া।

আর তিনি আমাদের শেখাচ্ছেন: যদি তুমি তোমার ফোকাস আখিরাতে রাখো, আল্লাহ তোমাকে সবকিছু সহজ করে দিবেন। কিছুই বড় মনে হবে না। তুমি বলবে: হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন। যখন তুমি এভাবে বলবে, তখন তোমার ফোকাস হবে আখিরাতে। তাহলে প্রথম বিষয় হলো তোমার চিন্তা-চেতনা, ফোকাস, দুনিয়ার নয়, আখিরাতের।

কিছু পরিবর্তন হবে না তোমার জীবনে। দুনিয়ার সমস্যাগুলো থাকবে—সন্তান সমস্যা করবে, পরিবারে অসুস্থতা থাকবে, চাকরি হারানোর আশঙ্কা থাকবে। সব থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা কমিয়ে দেবেন। আর একটা জিনিস, আল্লাহ তোমাকে মনে করাবেন যে তুমি প্রকৃতপক্ষে ধনী। হৃদয়ে ধনী।

ধনী মানে কি? যখন তুমি কারো প্রয়োজন অনুভব করবে না।

আর তৃতীয়টা হলো সবচেয়ে সুন্দর: দুনিয়া তোমার পেছনে দৌড়াবে। তুমি চাইবে না, তবুও এটা তোমার দিকে আসবে। কেউ কি কখনো এটা অনুভব করেছে? তুমি কোনো কিছুর পিছনে দৌড়াওনি, অথচ সেই জিনিস তোমার হাতে পড়ে গেছে? হ্যাঁ , এটাই বাস্তবতা।

দ্বিতীয় লক্ষণ–আমরা সবাই প্রতিদিন আল্লাহর অবাধ্যতা করি, তাহলে, যখন আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করি, তখন কী ঘটে?

তিনটি সম্ভাবনা থাকে:

১. অস্বীকার করা—"আমি করিনি!" বিশেষ করে কেউ দেখলে। অথচ আল্লাহ তো দেখছেন!

২. সবচেয়ে সাধারণ: যুক্তি দাঁড় করানো। "আমি ইচ্ছাকৃত করিনি," "অজান্তে হয়ে গেছে, এটা তো তেমন বড় বিষয় না।

৩. তুচ্ছ ভাবা—"কি এমন করলাম? সামান্য তো!

এখন মনে রাখো, এটা মুখস্থ করে নাও:

কোনো বড় গুনাহ নেই, যদি সাথে সাথে ক্ষমা চাওয়া হয়; আর কোনো ছোট গুনাহ নেই, যদি তা প্রতিনিয়ত করতে থাকো।

তুমি কখনো কোনো গুনাহকে তুচ্ছ ভাববে না।

এটা মনে রেখো, এটা নিজের জন্য। কাউকে দেখে বিচার করো না। নিজের জন্য ভাবো। হৃদয় পরিশুদ্ধ করার পুরো প্রসেস শুরু হয় নিজের ভেতর থেকে, অন্যদের থেকে নয়। তুমি যদি ফজরের নামাজ না পড়ে থাকো—বিশেষ করে ছুটির দিনে—কি ঘটে?

সাধারণ উত্তর হবে: "আমি ক্লান্ত ছিলাম," "ঘড়ির অ্যালার্ম বাজেনি।"

তারপর? কিছুই না। উঠলাম, অন্য নামাজ পড়লাম, জীবন চলে গেল।

কিন্তু ভাবো: আমি কার অবাধ্যতা করলাম?

নিজেকে বলো: "আল্লাহর এত দয়া, তারপরও আমি ফজর মিস করলাম?"

তখন তুমি সঠিক অনুশোচনা করবে।তুমি গুনাহ করলে সাথে সাথে আল্লাহর দিকে ফিরে যাও।

যেমন তুমি কারো প্রতি ভালোবাসা রাখো আর সে কষ্ট পেলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ পাও, তেমনি আল্লাহর প্রতিও হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন করেন না, এটা মনে রেখো। আমাদের সব ইবাদত আমাদের নিজেদের উপকারের জন্য।

তৃতীয় লক্ষণ– তোমার আল্লাহর স্মরণ—যিকর—এর সাথে সম্পর্ক কেমন?

যিকর অনেক ধরনের হতে পারে: তাসবিহ, কুরআন পড়া, সালাত, দু'আ, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা।

তোমার অবস্থান কোথায়? ০ থেকে ১০ স্কেলে নিজেকে মূল্যায়ন করো।

কেবল যখন তুমি সমস্যায় পড়, তখনই আল্লাহকে স্মরণ করো? নাকি সুখে-দুঃখে সবসময়?

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: মানুষ বিপদে পড়লে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আর যখন আল্লাহ তাকে কষ্ট থেকে মুক্ত করেন, তখন সে আল্লাহকে ভুলে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন এবং চারপাশে তাকিয়ে দেখছেন, “ইয়া আল্লাহ, এটা কী চমৎকার সৃষ্টি! যদি এটা তোমার সৃষ্টি হয়, তাহলে তুমি কত চমৎকার ।এটা হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। আপনি একজন মানুষ যার হৃদয় আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত।

এটা কি কঠিন? সত্যি বললে এটা কঠিন না। কিছু কিছু জিনিস কঠিন, এটা ঠিক, কিন্তু এটা কঠিন না। তাহলে আমরা কেন এটা করি না? তাহলে সমস্যা কোথায়? আমরা খুব ব্যস্ত, আমরা খুব বেশি বিভ্রান্ত। যত জীবন দ্রুত হয়, আমরা তত বেশি বিভ্রান্ত হই। আমাদের কাজের তালিকাও বাড়ে।

আল্লাহর ভালোবাসার চিহ্ন কী? আলেমরা বলেন—আপনি যদি আল্লাহকে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি সবসময় তাঁকে স্মরণ করবেন। আপনি যখন কাউকে ভালোবাসেন, আপনি কতবার তার কথা মনে করেন? সবসময়! যদি সে আপনাকে একটি বার্তা পাঠায়, আপনি সেটা মুখস্থ করে ফেলেন। বার বার পড়েন। অনেককে দেখান।

তাহলে কুরআন কী? সেটা কি আল্লাহর বার্তা নয়? হ্যাঁ, ওটাই তো আল্লাহর কথা। তাই হতাশ হবেন না।

জৈইনক ব্যক্তি বললেন – এটা একটা সত্য ঘটনা, আমি সেই মসজিদে ছিলাম। এক ইমাম রমজানের প্রথম রাত থেকেই দীর্ঘ কিরাআত শুরু করেন। আমি গিয়ে দেখি তিনি প্রথম পৃষ্ঠায় ছিলেন, পড়তেই থাকলেন, পড়তেই থাকলেন। আমি ভাবলাম তিনি এক জুয পড়েই থামবেন। না, তিনি দ্বিতীয় জুয, তৃতীয় জুয পর্যন্ত পড়লেন। তিনি পড়তেই থাকলেন। চার ঘণ্টা চলল। ইমামটি তরুণও নন, সম্ভবত ষাট বছর বয়স। তাঁর হৃদয়ে কী আছে যা আমার নেই? এটা শুধু কুরআনের কথা না—আমরা অনেকেই কুরআন পড়তে পারি। এটা হলো আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। আপনি যদি কুরআন মুখস্থ না-ও করেন, তবু আপনি খোলা কুরআন সামনে রেখে পড়তে পারেন। কুরআন মুখস্থ না থাকার অজুহাত মানা যায় না।

চতুর্থ —আপনার হৃদয় আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত কিনা তা বোঝার জন্য—যখন আপনি আল্লাহর জিকির করেন, সেটা যদি উপভোগ করেন, তবে বুঝবেন আপনি সংযুক্ত।

পঞ্চম —যদি আপনি কোনো ইবাদত মিস করেন, যেটা আপনি নিয়মিত করতেন, এবং আপনি তাতে কষ্ট পান, তাহলে বুঝবেন আপনার হৃদয় আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত। আপনি যেমন খাবার মিস করেন, তেমন ইবাদত মিস করেন কি না। রোজার সময় যেমন আপনি কোনো খাবার বা পানীয়ের জন্য আকুল থাকেন, তেমনি কি আপনি সালাত বা ইবাদতের জন্য আকুল থাকেন?

রমজানের মতো সময় আপনি কি মিস করেন? যদি করেন, তাহলে আপনার হৃদয় ভালো আছে। আপনি সেই মানুষটিকে মিস করছেন, যিনি আপনি রমজানে ছিলেন।

ষষ্ঠ—আপনার সালাতের প্রতি সম্পর্ক কেমন? আপনি কি ভাবেন এটা বোঝা , না এটা করতেই হবে, না এটা ভালোবাসা? সালাত যেন হয় প্রশান্তি। যখন আপনি ক্লান্ত, ভেঙে পড়েছেন, নামাজে দাঁড়ালেন, দু'রাকাত পড়লেন—কেমন লাগল? শান্তি। একটু হলেও মন হালকা হয়।

তাই আল্লাহর কাছে বলুন: *ইয়া আল্লাহ, আমাকে সালাতকে ভালোবাসতে শেখাও। যেন এটা বোঝা না হয়, বরং আনন্দ হয়।*

সালাত কী? আপনার ও আল্লাহর সম্পর্ক। আমি নিজের সাথে এইভাবে বলি: সালাতই সেই পরিমাপক, থার্মোমিটার, যা আমাকে বলে দেয়, আমার জীবনে আল্লাহ কোথায় আছেন। আমি ফরজ সালাত বলছি না, আমি বলছি সালাত — সামগ্রিকভাবে। আপনি কি জানেন, সালাত শব্দের অর্থ কী? সালাতের মূল শব্দ কী? সংযোগ" — সম্পর্ক। সালাত হলো আমার সংযোগ। এভাবেই ভাবুন — এটা আমার রশি। এই রশি কতটা শক্তিশালী, সেটা আমি ঠিক করি| আমরা কত সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় করি? কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় এত সময় দেই, যদিও সেখানে হারাম কিছু দেখি না — আলহামদুলিল্লাহ। ভিডিও দেখি, শিক্ষা নিচ্ছি — আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমার হাতে মাত্র পাঁচ মিনিটও নেই? আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে তাঁকে কী বলব? আমি কী বলব? "আমার সময় ছিল না? আমি জানতাম না? আল্লাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হলো সালাত। এ কারণেই বলা হয়, সুস্থ হৃদয়ের লক্ষণ হলো — যখন সে সালাতে প্রবেশ করে, সব কিছু ভুলে যায় এবং সে খুব প্রশান্তি অনুভব করে। আপনারা চেষ্টা করে দেখুন। দিনে কোনো একটা সময় যখন আপনি খারাপ অনুভব করেন, রাগান্বিত হন, ঘৃণা বা কষ্ট অনুভব করেন — কিছু করবেন না। কিছু না করে শুধু দাঁড়িয়ে যান এবং দুই রাকাআত সালাত পড়ুন — আপনি যা জানেন তাই পড়ুন। তারপর সালাম ফিরিয়ে নিজের অন্তরে তাকান। দেখুন, আগের সেই অনুভবের কতটা অবশিষ্ট আছে।

তাই এটা বলবেন না, আমি আল্লাহর কাছে যেতে চাই", আমি ইব্রাহিম (আ.) এর মতো হতে চাই", আমি চাই আমার দোয়া কবুল হোক", কিন্তু আপনি সালাত পড়েন না?

যে ব্যক্তি নিয়মিত অতিরিক্ত সালাত আদায় করে — যেটাকে আমরা " সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলি — যেটা রাসূল (সা.) সবসময় করতেন, সেই ব্যক্তি জান্নাতে একটি প্রাসাদ পাবেন। দুই রাকাআত ফজরের আগে, দুই বা চার যোহরের আগে, দুই বা চার পরে, শুধু দুই রাকাত মাগরিবের পরে, দুই ঈশার পরে — কিছু একটা হলেও, এই সুন্নাহ সালাতগুলো

বাদ দেবেন না। নিজেকে বলুন, এই সুন্নাহ না পড়া পর্যন্ত আমি নড়বো না। ঠিক তেমনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একটা অভ্যাস তৈরি করতে আপনার কতদিন লাগে?
৩০ থেকে ৪০ দিন — এভাবেই আপনাকে শেখানো হয়। ব্যস, এটাই। এখন আপনি সেই সালাতের সঙ্গে মায়া তৈরি করবেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি ফরজ সালাতের কথা বলিনি, আমি সেটা বলতেই চাইনি। আমি সরাসরি অতিরিক্ত সালাতের কথা বলেছি। আপনি যদি এই অতিরিক্ত সালাত পড়েন, তাহলে আপনি "স্নাতকোত্তর" করছেন, আপনি "পিএইচডি" শুরু করছেন |

বিশ্বাসীর সম্মান হলো তার সালাত | কিন্তু একজন মুমিনের হৃদয়ের ছয় নম্বর লক্ষণ হলো তার সালাতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো, সে সালাতকে ভালোবাসে, সে সালাতকে মিস করে, সে সালাতে শান্তি খুঁজে পায়।

কুরআনের একটি আয়াত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের মুমিনদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন। আয়াতটি শুরু হয় এভাবে:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [সূরা হাদীদ-১৬]

এটা কুরআনের একটি প্রশ্নচিহ্ন — কুরআনে অনেক আয়াতে আপনি প্রশ্ন পাবেন, যার কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি।

এগুলোকে বলা হয় প্রতিক প্রশ্ন — আল্লাহ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেন, আর উত্তর? কোথায়? উত্তর নেই।

উদাহরণ: আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? হ্যাঁ নাকি না?

এই আয়াত আপনি "সূরা যুমার"-এ পাবেন।

আরও একটা উদাহরণ:সূরা আর-রাহমান —বারবার কী আয়াত আসে

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

উত্তর কোথায়?চিন্তা করেছেন কখনও? উত্তর নেই। কেন , কারণ উত্তর স্পষ্ট

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কোনো নিয়ামত অস্বীকার করি না।"

তাই ফিরে আসুন সেই আয়াতে —

আল্লাহ বলছেন: “মুমিনদের জন্য সময় কি এসে যায়নি যে তারা আল্লাহর সামনে নত হবে। হ্যাঁ নাকি না? সময় কি এসে গেছে? তুমি কি প্রস্তুত? নাকি এখনো বলছো “আমাকে আরেকটু সময় দাও | অবশ্যই সময় শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু আমি বারবার দেরি করি, ঠেলে দিই যখন আমি ৪০ বছর হবো | যখন আমি বিয়ে করব, যখন সন্তানেরা স্কুল শেষ করবে, যখন তারা কলেজে যাবে...| এভাবে একটার পর একটা শেষ না হওয়া সময়সীমা...

এই আয়াত সাহাবাদের জন্য নাজিল হয়েছিল।

যখন তারা এই আয়াত শুনল, তারা সাথে সাথে বলল: জি, হে আল্লাহ, সময় এসে গেছে।

আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার ভাষা শিখুন।তার সঙ্গে আলাপ করুন।

বলুন:

“হে আল্লাহ, আজ থেকে আমার পথ পরিবর্তিত হবে। সাহায্য করুন, হে আল্লাহ আমি আলিম হতে চাই কিন্তু এটা সহজ না। অনেক বিভ্রান্তি আছে। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা আমি নিজেই। আল্লাহ সাহায্য করবেন। নিজেকে কখনো ছেড়ে দেবেন না।

সপ্তম লক্ষণ– আপনার অন্তর এখন ধীরে ধীরে সঠিক পথে এসেছে। দিনরাত যে বিষয়টি নিয়ে আপনি ভাবেন, চিন্তা করেন — সেটা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত।

আপনার চিন্তা, আপনার দুশ্চিন্তা, আপনার এনার্জি কোথায় যাচ্ছে? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে। আপনি এমন কাজ করেন যেগুলো তাঁকে খুশি করে। কুরআনের একটি অসাধারণ আয়াত আমি বাস্তবে দেখেছি:

আল্লাহ যখন হযরত মূসা (আ.)-কে বলেন: তুমি কেন দৌড়ে চলে এলে? আর তোমার কওমকে রেখে দিলে? (আল্লাহ তো জানেন সবকিছু — কিন্তু এ প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি কিছু বোঝাতে চান।) হযরত মূসা (আ.)-এর উত্তর দিয়েছিলেন:

“আমি তোমার দিকে দৌড়েছি, হে আল্লাহ, যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।”

আমাদের মধ্যে কতজন এ কথা বলে: আমি দৌড়াচ্ছি, আমি প্রতিযোগিতা করছি যেন আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আমরা দুনিয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করি:

আমার সন্তান যেন আমার বোনের সন্তানদের চেয়েও ভালো হয়। আমি চাই আমার বাসা, চাকরি, এলাকা সব সেরা হোক।

এটা কি ভুল? না। কেন না? যতক্ষণ উপার্জনের উপায় হালাল, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো — জান্নাতেও কি আপনি সেরা বাসাটি চান না?

সেরা ঘর, যেখানে আপনার প্রতিবেশী হবেন রাসূল ﷺ, সাহাবীরা আর আপনার অতিথি হবেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তাহলে আমরা কেন বলি

"শুধু জান্নাতে গেলেই হলো, রুমটা কেমন হলো তাতে কিছু আসে-যায় না।"

না, আমাদের জান্নাতের মান বাড়াতে হবে — যেমন আমরা দুনিয়াতে করি।

আপনারা সবাই যে দু'আটি জানেন, সেটি কী?

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন।"

এই দু'আ আমাদের কী শেখায়?

আমি দুনিয়ার ভালোও চাইতে পারি, আখিরাতের ভালোও চাইতে পারি। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো, আমাদের দুনিয়া-মুখী চিন্তা। হাসানাহ' বলতে কী বোঝায়? সহজভাবে — যে কোনো জিনিস যা আপনাকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যায়| "হে আল্লাহ, আমাকে এমন সন্তান দাও যারা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" "হে আল্লাহ, এমন সঙ্গী দাও যিনি আমাকে জান্নাতে পৌঁছাতে সাহায্য করবেন।" "আমাকে এমন চাকরি দাও, এমন ডিগ্রি, এমন ঘর দাও — যা জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে।

আপনার দুনিয়াতে থাকা মানে এই না যে আপনি আখিরাত হারাবেন। কিন্তু যদি আপনি শুধু দুনিয়াতেই আটকে থাকেন, তবে সেটা আখিরাতে প্রভাব ফেলবে।

আমি যদি কোনো বোনকে জিজ্ঞেস করি "তুমি সন্তান নিতে চাও কেন?

সবচেয়ে সাধারণ উত্তর কী হবে জানেন? তারা আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করবে।" আরেকটি সাধারণ উত্তর কী? তারা যেন আমার জন্য দোয়া করে, যখন আমি মারা যাব।"এটিও ভালো —কারণ মৃত্যু হলে তিনটি জিনিস ছাড়া সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়:

১. সদকায়ে জারিয়া (চলমান দান)

২. উপকারী জ্ঞান

৩. একজন নেক সন্তান, যে তোমার জন্য দোয়া করবে।

আল্লাহ যেন আপনাদের সবাইকে নেক সন্তান দান করেন। কিন্তু আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করি: আপনারা সবাই নেক, ইনশাআল্লাহ |আপনারা কতবার আপনার দাদির জন্য দোয়া করেন? (মায়ের জন্য না, দাদির জন্য!) আর আপনার প্রপিতামহীর নাম মনে আছে? কেন আমি এসব বলছি? ৫০ বছর পর আমাদের কেউ মনে রাখবে না। আপনি পছন্দ করুন আর না করুন — এটা বাস্তবতা। আপনি যদি কবরস্থানে যান ১৯০০ সালে জন্ম ১৯৪০ সালে মৃত্যু।

আজ কে তাদের মনে রাখে? তাই আপনি সন্তান নিতে চাচ্ছেন যাতে তারা আপনার জন্য দোয়া করে এতে ভুল নেই। কিন্তু পুরোপুরি এর ওপর নির্ভর করবেন না। কারণ সময়ের সাথে সাথে মানুষ ভুলে যায়। তাহলে কী করবেন?

অন্য দুইটি বিষয়ে মনোযোগ দিন:

১. সদকায়ে জারিয়া: সবচেয়ে সহজ হলো —একটি কূপ খনন করুন। যারাই পানি খাবে, প্রতি ফোঁটা পানির জন্য আপনি সওয়াব পাবেন।

২. উপকারী জ্ঞান: একটি বই লিখুন। কোনো বই স্পন্সর করুন। কোনো ছাত্র/ছাত্রীকে স্পন্সর করুন। ভালো কাজের সুযোগ অনেক।

আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি আসবে না। আর আয়াতটা মনে আছে: যখন মূসা (আ.) বলেছিলেন —

"আমি আপনার দিকে দৌড়ে এসেছি, হে আল্লাহ, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।"

তাই আল্লাহর আনুগত্যে দেরি করবেন না। অবিলম্বে করুন। আপনি দ্রুত এটি করুন, আজই করুন — আমরা জানি না আমরা কতদিন বাঁচব।

কেউ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি, যেখানে বলা হয়েছে:

"চিন্তা করো না, তুমি ২০৩৫ সালে মারা যাবে, তোমার সামনে ১0 বছর বাকি, যা খুশি করো।" কিন্তু আমরা কেউ জানি না। একমাত্র বাস্তবতা, একমাত্র সত্য এই জীবনে, তা হলো মৃত্যু। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এটিকে 'বিশ্বাসযোগ্যতা' বা "ইয়াকিন" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-জুমার (৬২: ৮) এর শেষ আয়াতে বলেছেন:

"তুমি তোমার প্রভুকে ইবাদত করো যতদিন না তুমি মৃত্যু নিশ্চিত (ইয়াকিন) এর সম্মুখীন হও।" এটা আসলে মৃত্যু।

আপনি কি জানেন, সময় কী? কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, একজন মুসলিমের জন্য সময় কী? আপনি কী বলবেন? সময় হলো একটি আমানত। এটি আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।

আল্লাহ কুরআনে কতবার সময়ের কসম করেছেন? অনেকবার, তাই না? যেমন "আল-আসর"—সময়, ওয়াস-শামস"—সূর্য, ওয়াল-লাইল"—রাত্রি। কেন আল্লাহ কসম করলেন সময়ের? আপনি যখন কুরআন পড়েন, তখন এভাবে ভাবতে হবে—আল্লাহ আমাকে কী শেখাতে চাইছেন? তিনি এটা এখানে কেন বললেন? আমরা কসম দিই কখন? যখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসছে। তাই একজন মুসলিম হিসেবে আমাকে সময়ের দিকে

গুরুত্ব সহকারে তাকাতে হবে। কেন? কারণ আমি সীমিত, আমার সময়ও সীমিত। আমরা কতবার বলি, আমার সময় নেই”? প্রায়ই, তাই না? আমাকে সময়কে বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। সময় একটি বিনিয়োগ—যার ফল আমি পাব জান্নাতে। আপনি যদি অর্থনৈতিক ভাষায় বলতে চান—“টাইম রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট”—তাহলে জান্নাতই হবে সেই রিটার্ন। তাই আল্লাহ কসম করেছেন, কারণ তিনি চান আমরা সময়ের গুরুত্ব বুঝি। সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত—তবে ব্যতিক্রম তারা যারা ঈমান আনে, ভালো কাজ করে, সত্য ও ধৈর্যের জন্য পরস্পরকে উপদেশ দেয়।

যার হৃদয় পবিত্র, সে তার সময় নিয়ে এতটাই চিন্তিত, যতটা একজন কৃপণ ব্যক্তি তার টাকার ব্যাপারে চিন্তিত হয়।

যদি কোনো কাজ ৫ মিনিটে শেষ হওয়া উচিত, আর তুমি সেটা ৭ মিনিটে করো, তাহলে তুমি অপচয় করছো। এবং কিয়ামতের দিনে আল্লাহ এর জন্য প্রশ্ন করবেন।” ভীতিকর কথা, বিশেষ করে যারা ইলম শেখে তাদের জন্য।

তোমাকে তোমার সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কারণ সময়ই আমার আসল বিনিয়োগ।

প্রতিদিনকে চার ভাগে ভাগ করা উচিত। তুমি যদি ভাবো কেবল ইবাদতই করতে হবে, সেটা বাস্তবতা নয়।

প্রথম ভাগ—তুমি আর আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক, কেবল আল্লাহর সঙ্গে সময় কাটানো।

দ্বিতীয় ভাগ—রিজিক অর্জন। তুমি বাইরে কাজ করো বা ঘরে কাজ করো, সেটি জরুরি।

তৃতীয় ভাগ—তুমি অন্য মানুষের সঙ্গে সময় কাটাও যাদের সঙ্গে থেকে তুমি আল্লাহর দিকে ঘনিষ্ঠ হতে পারো। ইনসান’ শব্দটা এসেছে ‘উনস’ থেকে—যার মানে হলো ‘আনন্দ, শান্তি, সঙ্গ। এ কারণেই আল্লাহ হাওয়াকে আদমের সঙ্গী বানালেন।

তোমার নিজের সঙ্গে—নিজেকে বুঝতে শেখা, নিজের জার্নি বোঝা, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা, নিজের কর্মের হিসাব রাখা, নিজের যত্ন নেওয়া।

সুতরাং চারটি ভাগ—

১. আল্লাহর সঙ্গে সময়

২. জীবিকা উপার্জনের সময়

৩. মানুষের সঙ্গে সময়

৪. নিজের সঙ্গে সময়

ইমাম আহমদ একবার বলেছিলেন:

"সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে?"

আপনি বলবেন, "যে আল্লাহর আনুগত্য করে, যে দান করে, সালাত পড়ে, ইত্যাদি।"
কিন্তু নবী (সা.) বললেন, শুধু দুইটি গুণ—একটি হৃদয়ের সঙ্গে, আরেকটি মুখের।

১. যার হৃদয় পবিত্র

২. যার বাক্য সত্য

লোকেরা বললো, সত্য কথা বলা তো বুঝলাম, কিন্তু পবিত্র হৃদয় মানে কী?
তিনি বললেন:
সেই হৃদয় যাতে কোনো পাপ নেই , জুলুম নেই , রাগ নেই , হিংসা নেই
এই চারটি বিষয় যদি কারো হৃদয়ে না থাকে, তাহলে তার হৃদয় পবিত্র হৃদয়।
তুমি যদি এখনো কাউকে মাফ করতে না পারো, বলো: "আমি তাকে কখনো ক্ষমা করবো না, তুমি জানো না সে আমাকে কী করেছে"—তবে তোমার হৃদয় এখনো পরিশুদ্ধ হয়নি।
একজন মা বলছিলেন, আমি তাকে কখনো ক্ষমা করতে পারি না, সে আমার মেয়েকে ধ্বংস করেছে।" তখন আমি বললাম, আল্লাহ আমাদের কত কিছু দেন, অথচ আমরা তাঁকে অবিরত অমান্য করি, তবুও তিনি আমাদের ক্ষমা করেন।"
তুমি ভালোবাসবে না—ঠিক আছে, কারণ আমরা মানুষ। কিন্তু ক্ষমা করতে না পারা মানে হৃদয়ের অসুস্থতা। যদি এখনও কারো প্রতি ক্ষোভ বা দুঃখ জমে থাকে, তাহলে বুঝে নাও—তুমি এখনো সেই "পরিশুদ্ধ হৃদয়"-এর জায়গায় পৌঁছাওনি।
সবশেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
অষ্টম লক্ষণ–তুমি নবী (সা.)-এর সুন্নাহ-কে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করো। তুমি বলো না—"এটা তো শুধু সুন্নাহ", বরং বলো—এটা আমার রাসূলের পথ, আমি তা অনুসরণ করবো।তিনি ﷺ আবু উমামার (র) হাত ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন: মুমিনদের মধ্যে কিছু হৃদয় আছে, যা আমার দিকে নরম, কোমল ও ঝুঁকে আছে।
তখন তিনি বললেন, সেই হৃদয় কীভাবে হয়? উত্তর ছিল: যারা আমার সুন্নাহ অনুসরণ করে। তুমি কখনোই সুন্নাহকে তুচ্ছ মনে করো না।বরং দোয়া করো:
হে আল্লাহ, আমাকে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপনকারী বানিয়ে দাও।
একটি পরিশুদ্ধ হৃদয় কীভাবে হয়?

১. সব চিন্তা ও দুশ্চিন্তা কেবল আল্লাহর জন্য

২. সব ভালোবাসা শুধুই আল্লাহর জন্য

৩. সব নিয়ত আল্লাহর জন্য

৪. সমগ্র দেহ—আচরণ, কাজ, বিশ্রাম—সব আল্লাহর জন্য

৫. ঘুমানো, জাগা, কথা বলা—সবকিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজা

৬. আলোচনায় আল্লাহর স্মরণ সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়

৭. চিন্তা ও মনোযোগ—সব আল্লাহকে খুশি করার জন্য

৮. হৃদয় সম্পূর্ণভাবে—আল্লাহর কাছে

এমন হৃদয় মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সবসময় আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন পরিশুদ্ধ হৃদয় দান করুন। আমাদের পরিবার, ভাই-বোন সকলকে এর অধিকারী করুন। আপনার পক্ষে কিছুই কঠিন নয় আমাদের জন্য কঠিন মনে হলেও, আপনার জন্য এটি খুবই সহজ।

গাফলতি ও উদাসীনতা

গাফলতি ও উদাসীনতা মানুষের আফসুস ও হা- হুতাশ বৃদ্ধি করে, শুভ পরিণতির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে, আখিরাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েস থেকে মাহরুম করে, ইবাদতে বিঘ্নতা ঘটায় , হিংসা -বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলে, পরিণামে লজ্জা, ভৎসনা , তিরস্কার ও অপমানের কারণ হয়।

জৈনক পুণ্যবান ব্যক্তি তার উস্তাদকে মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিল– মৃত্যুর পর আপনি দুনিয়ার কোন বিষয়টির উপর আক্ষেপ করাকে সবচেয়ে মারাত্মক পেয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, গাফলতি ও আসাবধানতার আক্ষেপকে|

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত যুন্নুন মিসরি (রহঃ)-কে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তাঁর মহান দরবারে দন্ডায়মান করে বলেছেন, হে মিথ্যুক হে অসত্যের দাবিদার! তুমি আমার প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসার দাবী করেছো, অতঃপর তা হতে উদাসীন ও অন্যমনস্ক হয়ে গেছো।" জনৈক বুযুর্গ স্বীয় পিতাকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিল, আব্বাজান পরকালে এই জগতে আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, ওহে বৎস! দুনিয়াতে আমি গাফেল ও উদাসীন ছিলাম এবং সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়েছে, ফলে এখন আমার নানা ধরণের কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।"

যাহরুর রিয়াদ কিতাবে আছে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সাথে মালাকুল-মাওতের সখ্যতার সম্পর্ক ছিল, তাই মালাকুল-মাওত প্রায়ই হযরত ইয়াকুবের (আঃ) এর নিকট আসা যাওয়া করতেন । একদিন হযরত ইয়াকুব (আ.) তাকে বললেন– আপনি কি আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন , না জান কবজ করতে? তিনি বললেন সাক্ষাতের উদ্দেশে¨| অতঃপর হযরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আপনার নিকট আমার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন আছে যে আমার মৃত্যুর সময় যখনB উপস্থিত হবে এবং আপনি আমার জান কবজ করার উদ্দেশ্যে আগমন করবেন তখন আগেই আমাকে অবগত করে দিবেন মালাকুল মউত সম্মতি ব্যক্ত করে বললেন মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই আমি আপনার নিকট তিনটি বার্তা পাঠাবো তখন বুঝে নিবেন যে আপনার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী| কিছুদিন পর হযরত ইয়াকুব অন্তিম সময়ে মালাকুল মউত উপস্থিত হলে তিনি আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন উত্তরে মালাকুলমউত রুহ কবজ এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন উত্তর শুনে হযরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্মিত হয়ে বললেন আপনি কি আমার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বে দূত পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন না? কিন্তু কই , মৃত্যুর ফেরেস্তা বললেন হে আল্লাহর নবী আমি ঠিকই আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছি

কিন্তু আপনি তা লক্ষ্য করেন নাই আপনার কেশ রাশির কৃষ্ণতার পর শুভ্রতা , আপনার দৈহিক শক্তির প্রাবল্যের পর দুর্বলতা এবং আপনার দেহ সোজা ও সটান থাকার পর বক্রতাই মৃত্যুর পূর্বে আপনার কাছে প্রেরিত আমার দূত বা বার্তাবাহক|

হযরত আবু আলী দাক্কাক্ব রহিমাহুল্লাহ বলেন: প্রখ্যাত এক বুজুর্গের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখার জন্য আমি খেদমতে হাজির হলাম তখন তার শিষ্যগন তারপাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তিনি ক্রন্দন করছিলেন| আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি এই অন্তিম সময়ে দুনিয়ার মায়া-মহব্বত ও বিচ্ছেদের কারণে কান্নাকাটি করছেন? সেই উওরে তিনি বললেন না বরং আমি আমার নামাজের অসারত্বের কথা স্মরণ করে কাঁদছি| জীবনের সমস্ত নামাজ আমি বিনষ্ট করে ফেলেছি | আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কিভাবে? আপনি তো সারা জীবন নামাজ আদায় করেছেন| তিনি বললেন আমি জীবনে যত নামাজই পড়েছি , সিজদা করেছি , সিজদা হতে মাথা উঠিয়েছি সব সময় আমার অন্তরে গাফিলতি ও অবহেলা বিরাজ করত মনোযোগ সহকারে আমি রুকু - সিজদাহ করতে পারি নাই আর আজকে আমার সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হচ্ছে |এতটুকু বলে তিনি একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন এবং কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন| সেগুলো সারমর্ম হচ্ছে– হাশরের দিন কিয়ামতের ময়দানে আমার কি অবস্থা হবে সে বিষয় চিন্তা করে আমি উদ্বিগ্ন হতাশা গ্রস্থ দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ইজ্জত সম্মানের পর জানিনা কবরের ঘোর অন্ধকারে একাকী কি অবস্থায় আমাকে কাটাতে হবে| আমি অতি উত্তমরূপে ধ্যান করেছি- যখন আমলনামা হস্তান্তর করা হবে তখন না জানি আমার কি দুর্দশা হবে হায় আল্লাহ আপনার উপরে আমার ভরসা আমার আশা আপনার দয়া ও রহমত ছাড়া আমার কোন গত্যন্ত নাই মেহেরবানী করে আপনি আমাকে সেদিন মাফ করে দিন|

উয়ুনুন আখবার গ্রন্থে হযরত শাক্বীক বলখী রহিমাহুল্লাহ থেকে উদ্ধত হয়েছে তিনি বলেছেন তিনটি বিষয়ে এমন রয়েছে মানুষ মুখে মুখে যেগুলোর খুব বুলি আওড়িয়ে থাকে কিন্তু কার্যক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্য করা যায় |এক– মানুষ মুখের স্বীকারোক্তি করে যে আমরা আল্লাহর বান্দা একমাত্র তারই দাস কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে প্রতিটি কাজে আল্লাহর অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করে থাকে| দুই – মানুষ বলে থাকে আল্লাহ আমাদের জীবিকা ও রুজি রোজগারের জিম্মাদার সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে ফিকির করবেন কিন্তু এই কথা বলার সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর কখনো দুনিয়ার ধন সম্পদ ব্যতিরেকে পরিতৃপ্ত হয় না সর্বদা দুনিয়ার মহে আচ্ছন্ন থাকে এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মাল সামান একত্রিত করনে । মানুষ বলে থাকে মৃত্যু আসবে এবং এটা সকলের জন্য অবধারিত কিন্তু তাদের ব্যস্ততা ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ দেখে মনে হয় যে তারা

কোনদিন মরবে না একটু চিন্তা করে দেখো মহান আল্লাহর দরবারে তুমি কোন দেহটি নিয়ে হাজির হবে? কোন মুখে তুমি কথা বলবে? মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় থেকে এক মুহূর্তের জন্য সংক্রামুক্ত হয়ো না| কারণ তিনি তোমার ভালো মন্দ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নির্দেশকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে পালন করো এবং নিজের জাহের বাতেন চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা ও কাজকর্মে সর্বোচ্চভাবে এক আল্লাহর জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাও| হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমার অনুগত বান্দার প্রতি আমি অনুগ্রহ করে থাকি যে আমাকে ভালবাসে আমি তাকে ভালোবাসি যে আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাকে দান করি এবং যে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করি|

অতএব, মানবের কর্তব্য হচ্ছে ইখলাসপূর্ণ আনুগত্যের সাথে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়া| দুনিয়ার বালা মুসিবত ও দুঃখে সবর করা, আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত সমৃদ্ধ শোকর আদায় করা এবং সর্বাবস্থায় মাওলার প্রতি সন্তুষ্ট ও উদগ্রীব থাকা| আল্লাহ তাআলা বলেন– যে ব্যক্তি আমার অভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট থাকে না আমার যাচাই ও পরীক্ষায় সবর করে না, আমার নেয়ামতের শোকর আদায় করেনা, এবং আমার পরিণত দানের তুষ্ট , থাকে না সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন প্রভু তালাশ করে|

হযরত হাসান বসরী রহঃ নিকট আরজ করলো হুজুর আমি ইবাদতের স্বাদ পাই না এর কারণ কি? তিনি বললেন হয়তো তুমি এমন কোন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নাই| জেনে রাখ ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে পরিপূর্ণ রূপে ত্যাগ করার নাম| এমন কি ইবাদতের স্বাদ অন্বেষণ করাও এবাদতের পরিপন্থী কাজ| সুতরাং তুমি সকল গাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত পবিত্র হয়ে এক আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হও| তাহলে, অবশ্যই তুমি স্বীয় আরাধনা স্বাদ ও লজ্জত অনুভব করতে পারবে |

অহংকার

হৃদয়ের রোগ কী? নম্বর এক হলো অহংকার। এটা গর্ব। অহংকারই হল প্রথম রোগ। যখন আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন, তখন শয়তান অবাধ্যতা করল এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হল|—আশরাফ আলি থানবী রহ,.বলেন–

শয়তান কেনো শয়তান হলো?

১।ওয়া আলেম ভি থা ,

২।আবেদ ভি থা ,

৩।আকাল ভি থা ,

৪।আশেক নেহী থা।

সে যদি আল্লাহর আশেক হতো তাহলে আল্লাহ হুকুম দিয়েছে তাকে আদমকে সিজদা করতে সে কোনো কথা ছাড়া সিজদা করতো।

আশেক যখন হবে তখন আকল কাজ করবে না।আশেক যখন হবে আল্লাহর হুকুম কে তার চেয়েও বেশি নিবে। প্রকৃত ইলম যত বেশি হবে সে ততবেশি বিনয়ী হবে। ইলম যাতে অহংকার না হয় তাই আমল করতে হবে। ইলমের তাপ আমলের দ্বারা ঠান্ডা হয়। অহংকারের কিছু উদাহরণ–রামাদানের সময় যখন আপনি মসজিদে যান | যেখানে যান না কেন | আপনার পাশে কেউ বসে| আপনার বন্ধুটি এসে বসে| আপনি কেন চান আপনার বন্ধুই বসুক? অন্য মহিলা কি মুসলিম না? তিনি কি আল্লাহকে খুশি করতে আসেননি? তিনি কি নামাজ পড়তে আসেননি? আপনি কেন খুশি হন না?

আপনার মেয়ে এসে যদি বলে, মা, বাবা বা দুজনকেই—একজন চমৎকার মুসলিম আমাকে বিয়ে করতে চায়|

আর সে ব্যক্তি কালো এবং দরীদ্র ,নীরবতা দেখানো। এটাই হলো অহংকার।

কেন? ইসলাম প্রথম যে কাজটি করেছিল তা হলো এই দেয়াল ভেঙে ফেলা।

যিনি আল্লাহর সবচেয়ে কাছের ছিলেন| যার গলা সবচেয়ে লম্বা ছিল| তিনি আজান দিতেন, তিনি ছিলেন একজন দাস। আমি বলবো, তিনি ছিলেন "কালো"। আপনি কি মনে করেন যদি তিনি প্রস্তাব দিতেন, কেউ বলত "না", কারণ তিনি কালো? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা অনুভব করছেন।

সবাই আল্লাহর বান্দা। যতক্ষণ তারা মুহাম্মদ (সা.) কে মানে, আর যদি না মানে, তাহলে অবশ্যই না।

নম্বর দুই—বিশেষ করে নারীরা নিজেi প্রশংসা করা। অপ্রত্যক্ষভাবে নিজের প্রশংসা করা। আমি কীভাবে নিজেi প্রশংসা করি?

প্রত্যেক বয়সের মানুষের নিজের প্রশংসা করার আলাদা আলাদা পদ্ধতি থাকে।

হাইস্কুল শিক্ষার্থীরা — যারা ১৬ বা ১৭ বছর বয়সী — তারা কীভাবে নিজের প্রশংসা করে?

তারা তাদের বাবা-মাকে প্রশংসার মাধ্যমে করে।তুমি জানো আমার বাবা কী করেন?তুমি জানো আমার বাবা কী গাড়ি চালান?

কলেজ পর্যায়ে মানুষ কী নিয়ে গর্ব করে? কোন কলেজে যাচ্ছে সেটা নিয়ে।

আল্লাহ কি আপনাকে কোনো বার্তা পাঠিয়েছেন, যাতে লেখা আছে যে যারা ওমুক কলেজে' যাবে তারা জান্নাতে যাবে? যদি তাই হতো, তাহলে আমিও জীবন দিয়ে চেষ্টা করতাম সেখানে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আসলে এটা গর্বের বিষয়। আপনার ছেলে বা মেয়ে এতে কোনো ভুল নেই, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তারা এই চান্স পেয়েছে| কিন্তু আপনি কথার মাঝখানে নিশ্চিত করবেন যে সবাই জানে আপনার সন্তান কোন কলেজে পড়ে। কেন? আমার এটা জানা দরকার কেন? কারণ আপনি পরোক্ষভাবে নিজেকে প্রশংসা করছেন| তারা আমার সন্তান। আপনি যদি কোনো মাকে কষ্ট দিতে চান, তাহলে তার সন্তানের সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক বলুন|তখনই দেখবেন মা কেমন প্রতিক্রিয়া দেয়। আমি জানি সন্তান কী করে|তারা আমার কাছে এসেছিল কথা বলতে| আর মা তাদের এমনভাবে প্রশংসা করলো যেন তারা ফেরেশতা। কারণ সে নিজেকে প্রশংসা করছে। নিজেকে ভালো মনে করা যা আপনারা সবাই অনুভব করেন|এমনকি যাদের সন্তান নেই তারাও|যেমন- রান্না করা। প্রত্যেকেই ভাবে সে-ই সেরা রাঁধুনি।আর রান্নার ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে।

কেন? এটি কি আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?এই প্রশ্নটি প্রত্যেককে নিজেকে করতে হবে—এটা কি আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? বরং এটা হয়তো আমাকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে|

রাসুল (সা.) বলেছিলেন তিনটি বিষয় ধ্বংসকারী। তিনটি জিনিস ধ্বংস করে।

তিনি বলেছিলেন—এই তিনটি তোমাকে ধ্বংস করবে। মানে: আমার ভালো আমল ধ্বংস করে দেবে, আমার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে দেবে, আল্লাহ আমার থেকে দূরে হয়ে যাবেন। কি সেই তিনটি?

১. লোভ ,

২. আত্মপ্রশংসা | আমি মনে করি আমি সেরা।যখন আমাকে প্রশংসা করা হয় না, কিন্তু আমার বন্ধুকে করা হয়|তখন আমি খুব কষ্ট পাই। আল্লাহ তখন আপনাকে পরীক্ষা করছেন।আপনার বন্ধুকে প্রশংসা করা হচ্ছে, আপনাকে না—

আপনি কী বলবেন? "আলহামদুলিল্লাহ, তারা আমার বিষয়ে জানে না।
আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা লা আমার বিষয়গুলো গোপন করেছেন।"

৩. প্রদর্শনবাদ–শো অফ করা । সন্তানদের প্রশংসা করা,বাড়ি দেখানো, ফার্নিচার দেখানো, নিজের সৌন্দর্য দেখানো। সোশ্যাল মিডিয়া এসব আরও কঠিন করে দিচ্ছে। আমরা আল্লাহর দিকে মনোযোগী থাকতে পারছি না।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার অহংকার থেকে হেফাজত করুন আমিন।

একটি উওম দোয়া

¡লুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়াটি পড়তেন যাতে তিনি দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, অক্ষমতা, অলসতা ইত্যাদি থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন, সেই দোয়াটি n‡jvÑ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে, ঋণের ভারে পিষ্ট হওয়া এবং মানুষের উপর প্রভাবাধীন হয়ে পড়া থেকে।"

সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত দোয়ায় আমরা — আমি, আপনি, কিংবা আমরা সবাই — আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাদের রক্ষা করেন অথবা সাহায্য করেন যখন আমরা দুটি অনুভূতির সম্মুখীন হই।

এই দোয়ার প্রথম অংশটি একটি অনুভূতি সম্পর্কে, এটি এমন কিছু যা আমি অনুভব করি। পরবর্তী অংশটি কিছু করা বা না করার সাথে সম্পর্কিত।

তাহলে প্রথম জিনিস হলো অনুভব করা — আমি চিন্তিত অনুভব করি।

যখন আপনি ওলামাদের ব্যাখ্যার দিকে তাকান, অথবা এই দোয়ার কোনো ব্যাখ্যা পড়েন, তারা বলেন "হাম" মানে এমন চিন্তা যা এখনো ঘটেনি, কিন্তু আপনি তা নিয়ে ভাবছেন এবং আপনি আশঙ্কা করছেন যে এটি ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সন্তান। সন্তান হলো সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার উৎস। সবাই তাদের সন্তানদের নিয়ে কথা বলে — তাদের বয়স যাই হোক না কেন। যদি তারা ছোট হয়, চিন্তা করে তারা খাচ্ছে কি না, বেড়ে উঠছে কি না। যদি তারা স্কুলে যায় — তারা স্কুলে যাবে তো? যদি হাই স্কুলে থাকে — কোন কলেজে যাবে? তারা যদি কলেজে যায় — ঠিকমতো আবেদন করবে তো? সে ভালো করে লিখবে তো? তার ব্যক্তিগত বিবৃতি ঠিক আছে তো? সে সাক্ষাৎকার পাবে তো? গৃহীত হবে তো?

এই সবই এমন কিছু যা এখনো ঘটেনি, কিন্তু আপনি চিন্তা করছেন এটা ঘটবে কি না। আমাদের জীবনের কতটা সময় আমরা এই ধরনের চিন্তায় ব্যয় করি?

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই — কিছুই এখনো ঘটেনি। কেউ অসুস্থ হয়নি, কিছু হয়নি — তবুও আমি চিন্তিত। সবার মধ্যে ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে — আমি খুব চিন্তায় আছি। যদিও এখনো কিছু হয়নি। আর যখন এই চিন্তা "হাম" হয়ে যায়, অর্থাৎ এটা এত বেশি হয় যে আপনাকে অক্ষম করে ফেলে — আপনার চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায় — তখন আমরা বলি–

"আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এই 'হাম' থেকে।"

আমাকে এই অনুভূতি থেকে রক্ষা করো, কারণ এটা এখনো কোনো কাজ নয়, এটা কেবলমাত্র একটি অনুভূতি। এটা আত্মার অনুভূতি।

ইমাম ইবনে আল-কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, রাসুল ﷺ প্রথমেই আল্লাহর কাছে এমন কিছু থেকে রক্ষা চেয়েছেন যা ভিতর থেকে প্রভাব ফেলে — আত্মায় আঘাত দেয়, হৃদয়ে পৌঁছে যায় এবং শেষে শরীরকেও প্রভাবিত করে। যেমন আপনি বলেন: "আমি বাইরে যেতে ইচ্ছুক না, আমি খুব চিন্তিত। আমি আজ রান্নাও করিনি।" অথচ কিছুই ঘটেনি। হাম এমন কিছু যা পুরোপুরি আপনাকে অক্ষম করে ফেলে। এতে খারাপ চিন্তাও আছে, আবার ভালো চিন্তাও থাকতে পারে।

ভালো চিন্তা কী? আপনি যদি আখিরাত নিয়ে চিন্তিত থাকেন। এটা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিস। তিনি বলেছেন:

"যার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয় আখিরাত — সে চিন্তা করে, আমি কোথায় শেষ হব? আমরা কি কখনো এটা নিয়ে চিন্তা করি? আমি জান্নাতে গেলে কারা আমার প্রতিবেশী হবে? জান্নাতে আমি কী খাব? আমার কবর কেমন হবে? আমি কবরের প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেব?

তিনি ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আখিরাতকে নিজের মূল চিন্তা বানায় — আল্লাহ তাকে অন্তর থেকে ধনী করে দেন।"

অর্থাৎ সে এই দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। আর আল্লাহ তার সব দুনিয়াবি চিন্তা একত্র করে একটি বানিয়ে দেন। অর্থাৎ একসাথে ১০টা চিন্তা থাকে না। আমি অনুভব করি আমি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছি, আজ আমাকে অনেক কিছু করতে হবে। না, আখিরাতের কথা ভাবো | তখন সব এক হয়ে যাবে।

যদি কেউ দুনিয়াকে তার মূল চিন্তা বানায় | মানে দুনিয়াবি জিনিস, বস্তুগত জীবন| তবে সেটি তার কাছে এমনভাবেই চলে আসবে, এমনকি যদি সে তা না চায় তবুও, জোর করে এসে যাবে। শুধু একটি কাজ করলেই — আখিরাত নিয়ে চিন্তা করলেই — এই পরিবর্তন আসবে। অন্যদিকে, আমরা অধিকাংশই যা করি তা হলো: "যার মূল চিন্তা হয় দুনিয়া"| এই দুনিয়া কী?

আল্লাহ কুরআনে দুনিয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন:

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি" —

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(সম্পদ ও সন্তান হলো দুনিয়ার শোভা)।

এটাই আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই নিয়ে চিন্তিত থাকি — সত্যি না মিথ্যা?
আমার কাছে যদি মাসে ১০ ডলার থাকে, আমি সেটি নিয়ে চিন্তিত।
আর যদি আমার এক মিলিয়ন ডলার থাকে, তখন আমি সেই এক মিলিয়ন নিয়ে চিন্তিত থাকি।
কারো চিন্তার পরিমাণ নির্ভর করে সে কে বা জীবনের কোন পর্যায়ে আছে তার ওপর। রাসুল (সা.) বলছেন:
"আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই 'হাম' থেকে" — অর্থাৎ এমন চিন্তা থেকে যা এখনো ঘটেনি কিন্তু মানুষ চিন্তায় পড়ে গেছে।
তাহলে যদি আপনি দুনিয়াকে আপনার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানান, কী ঘটবে?
আল্লাহ তাকে এমন মনে করাবেন যেন সে গরিব| অর্থাৎ সে সব সময় অনুভব করবে, আমার কাছে কিছুই নেই, যথেষ্ট নেই।
যখন আপনি ঘরে ফেরেন বা বিদেশে ভ্রমণে যান — বিশেষ করে কিছু নির্দিষ্ট দেশে| তখন আপনি উপলব্ধি করেন, আমার কত কিছু আছে! আমি কত ভালো আছি, কত সমৃদ্ধ!
সুতরাং, যদি আপনি দুনিয়াকে নিয়ে চিন্তা করেন —
১. আল্লাহ আপনাকে এমন অনুভব করাবেন যেন আপনার কিছুই নেই।
২. তিনি আপনাকে অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত করে দেবেন — আপনি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করবেন।
৩. আর কিছুই আপনার কাছে আসবে না, শুধুমাত্র যা আল্লাহ আপনার জন্য নির্ধারণ করেছেন — তার বাইরে কিছুই নয়।
সব দুশ্চিন্তা করে করে আপনি কিছুই পরিবর্তন করতে পারবেন না। আমরা তো নিজেরাও বলি, চিন্তা করলেও কিছু হবে না।
এবার "হুযন" নিয়ে আসি। হুযন কী? এটা হলো কষ্ট বা ব্যথা — এমন কিছু যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, আর আপনি এখন তা নিয়ে কাঁদছেন বা দুঃখ অনুভব করছেন। আমরা কী নিয়ে কাঁদি বা দুঃখ পাই?
যে বিয়ে করেনি, অথবা খারাপ স্ত্রী/স্বামী পেয়েছে, অথবা দাম্পত্য জীবন সুখের নয় — যাই হোক না কেন।কেউ সন্তান পায় না, কেউ ছেলে চায় কিন্তু শুধু মেয়ে হয়েছে| এমন হাজারো কারণে মানুষ দুঃখ পায়।
এই হলো হুযন — একটি ঘটনা ঘটে গেছে, এবং আপনি তার কারণে দুঃখ অনুভব করছেন।

তাহলে আপনি কী করবেন? আমি তো দুঃখিত — আমার সন্তান খুশি নয়, আমার মেয়ে ভালো নেই, আমি পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারিনি, বা ভর্তি হয়েও বুঝলাম এটা আমার জন্য নয়, বন্ধুও নেই। এইসব তো বয়স অনুযায়ী বদলায়। তাহলে করণীয় কী? আবার আল্লাহ কী শিখিয়েছেন, সেদিকে ফিরে যান।

আল্লাহ বলেন:

“যে কোনো বিপদ, যা তোমার ওপর পড়ে — তা এই পৃথিবীতে হোক, কিংবা তোমার নিজের মধ্যে — তা কিছুই নয়, তা আগে থেকেই লিপিবদ্ধ।”

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

(সূরা হাদীদ: ২২)

এখানে “মুসীবাহ” শব্দটি ব্যবহার হয়েছে| এর মানে সাধারণ কিছু নয়, বরং বড় ধরণের বিপদ। “ফিল আরদ” — অর্থাৎ পৃথিবীতে যেটা ঘটছে — হতে পারে জাতির উপর, সম্প্রদায়ের উপর। “ওয়ালা ফি আনফুসিকুম” — অথবা এটা ব্যক্তি পর্যায়ে — আমার শরীর, আমার পরিবার, আমার সামাজিক পরিবেশে।

যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ বলছেন: “এই সব বিপদ আগে থেকেই লিপিবদ্ধ।”

“মিন কাবলি আন নাবরআহা” — তোমার জন্মের আগেই এটি লেখা হয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যায়। মজার সময়ে তো বিষয়টা হালকা থাকে, কিন্তু যখন আমি ভাবি আমার সাথে কী হয়েছে, তখন মন ভারী হয়ে যায়। আমি ভাবতে থাকি — কেন আমি এমন করলাম? কেন আমি ওভাবে বললাম? আমি এখন কী করবো? আমি বুঝতেই পারলাম না, কখন "হাম" (চিন্তা/উদ্বেগ) "হুযন" (দুঃখ/বেদনা) হয়ে গেল। আমি বললাম — “আমি এটা অনুভব করছি, অথচ আমি তো জানি, আমার এমনটা অনুভব করা উচিত নয়।” এবং নবী করিম (সা.)-এর একটি হাদিস আছে — তিনি বলেন,

“প্রতিটি বিষয়ের একটি বাস্তবতা আছে।”

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً

(প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সত্যিকারের রূপ রয়েছে)

আর মানুষ কখন সত্যিকারভাবে মুমিন হয়? যখন সে বিশ্বাস করে:

যা আমার সঙ্গে ঘটেছে, তা আমাi সাথেই হতো। যা আমাকে এড়িয়েছে, তা কখনও আমার হতে পারতো না।”

ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك

আপনি বা আমি তখনই ঈমানের পূর্ণতা অর্জন করবো| যখন নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবো — যা কিছু আমাকে আঘাত করেছে, সেটা এড়ানো সম্ভব ছিল না।

আজ যদি আমি ফ্লু (জ্বর) পাই —এটা মানে দাঁড়ায়, এটা আমার ভাগ্যেই লেখা ছিল। আর যা-ই আমি করি না কেন, সেটা আটকাতে পারতাম না।

যা আমার হওয়ার ছিল, তা হবেই। আর যা আমাকে এড়িয়ে গেছে, তা আমার হওয়ার ছিল না। এটা আমাকে কী অনুভব করায়? শান্তি।

এই জন্যেই নবী করিম ﷺ এই দোয়া করেছেন —

"হে আল্লাহ, আমাকে এই অনুভূতি থেকে রক্ষা করো।"

এটা প্রমাণ করে, এই অনুভূতিগুলো সত্যি — কল্পনা নয়। হ্যাঁ, এই অনুভূতি বাস্তব। আর কুরআনেও তো আছে —

لا تحزن إن الله معنا

দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

তাহলে দুঃখ অনুভব করা সমস্যা নয়| সমস্যা তখনই, যখন এই দুঃখ আমাকে অসাড় করে ফেলে | আমি যেন কিছুই করতে পারি না। আমি দুঃখিত হই — যদি আমি সালাত মিস করি। আমি দুঃখিত হই — যদি আমি আল্লাহর কোনো ইবাদত বাদ দিই। এই ধরনের দুঃখ ভালো।

কিন্তু এমন দুঃখ যা আমাকে দুর্বল করে তোলে| অথবা আমি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাই , অথবা আরও খারাপ আমি বলতে থাকি: "কেন আমার সঙ্গেই এমন হলো? আমি তো আল্লাহকে ভালোবাসি, আমি তো নামাজ পড়ি, আমি তো ভালো কাজ করি। তবে কেন এমন হলো? এইরকম কথাবার্তা দুঃখের ভুল প্রতিক্রিয়া।

নবী করিম ﷺ— যিনি নিখুঁত মানুষ | তিনিও এই অনুভূতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। আমরা তো তবুও সাধারণ মানুষ।

তাহলে প্রথম দোয়া ছিল: "হাম ও হুযন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।"

দ্বিতীয় দোয়া: "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই— 'আযযি' ও 'কাসল' থেকে।"

আযযি অর্থ: শারীরিক অক্ষমতা। 'কাসল' অর্থ: অলসতা, অনিচ্ছা বা মানসিক অক্ষমতা। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

আযযি — আপনি করতে চান, কিন্তু পারছেন না। উদাহরণস্বরূপ:

আগে আপনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। এখন দুর্ঘটনার কারণে আর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না। এটা হলো শারীরিক অক্ষমতা। আগে আপনি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন, কিন্তু হঠাৎ করে আপনি এমন অসুস্থ হলেন, যা রোজা রাখার ক্ষমতা কেড়ে নিলো।এই সময়েই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন:

"হে আল্লাহ, আমাকে এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করো।"

এখন আপনি সুস্থ — তাই এখনই দোয়া করুন। কারণ স্বাস্থ্য চিরকাল থাকে না। সবকিছু এক মুহূর্তেই পাল্টে যেতে পারে।

আজ আপনি হাঁটতে পারেন, কথা বলতে পারেন, পড়তে পারেন, দেখতে পারেন এইসব যেন হারিয়ে না যায়, তাই এখনই দোয়া করুন।

আযযি মানে — অক্ষমতা, দুর্বলতা| এমন একটি অবস্থা যেখানে আপনি কিছু করতে চান, কিন্তু পারেন না। এটাই হলো ‘হাম ও হুযন’-এর পরে দ্বিতীয় দোয়ার অর্থ। "যখন আমার ব্লাড সুগার কমে যায়, তখন আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। কিছু একটা আমাকে থামায়।"এটা ‘আজজ’ (অক্ষমতা) — মানে আমি চাইলেও পারি না। আর 'কাসাল' (كسل) তার পুরোপুরি বিপরীত| কাসাল মানে অলসতা, নির্জীবতা, নিষ্ক্রিয়তা। এটা মানে — আমি পারি, কিন্তু করতে মন চায় না। আমার শরীর ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা কোনটা বেশি অনুভব করি? সাধারণভাবে — কাসাল।

উদাহরণস্বরূপ: তুমি কাল রোযা রাখবে?

– উম্ম... ইচ্ছা করছে না।”

এটা অলসতা। এর বিপরীতে কেউ যদি বলে,

– আমি পারছি না, কারণ ডাক্তারের নিষেধ আছে।” তাহলে সেটা ‘আজজ’, মানে শারীরিক অক্ষমতা।

আরেকটা উদাহরণ:

– তুমি ফজরের নামাযে উঠো?

– এই দিনগুলোতে না, খুব কঠিন লাগে।” কিন্তু আজকাল তো মানুষ ৫:৩০ এ রাস্তা ধরে নেয়। তাহলে ৫:৩০-এর একটু আগে উঠলে আপনি দুই রাকাত নামাজ পড়তেই পারেন। কিন্তু আমরা কী বলি? বিছানা এত আরামদায়ক, ঘুম এত মিষ্টি, আমি বিছানা ছাড়তেই চাই না। আপনি জেগে আছেন, কিন্তু উঠতে মন চায় না — এটাই কাসাল। অন্যদিকে কেউ যদি বলে, আমার ওষুধ খেতে হয়, যার জন্য আমি নামায মিস করি।”তাহলে সেটা ‘আজজ’, কারণ তার সক্ষমতা নেই।

তাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি — যেন উনি আমাদের এই দুই অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। এখন কোরআনে কী আল্লাহ 'কাসাল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন? হ্যাঁ, করেছেন — নেতিবাচক অর্থে। কখন?

যখন তিনি মুনাফিকদের (ভণ্ডদের) বর্ণনা করেন।

وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ

(সূরা নিসা: ১৪২)

"যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, অলসভাবে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য।"

এই হলো ‘কাসাল’ — অলসতা। এটা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আর তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। কখনো সখনো — হয়তো সপ্তাহে একবার।

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো।”

তাই আমি কাসাল হতে চাই না। আমরা মাঝে মাঝে এটা অনুভব করি —

বিশেষ করে সপ্তাহান্তে। আজ আমি কিছু করতে চাই না।” বিছানা এত আরামদায়ক।” বাইরে অনেক ঠান্ডা।”

কিন্তু মনে রাখা দরকার: কাজ না থাকলেও, করার মতো কিছু সবসময়ই থাকে।

এবার প্রথম দুই দোয়ার সংযুক্তি দেখি:

"আল্লাহুম্মা ইন্নিই আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান..." আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই চিন্তা ও দুঃখ থেকে| কারণ এই দুইটা আমার ভেতরের শক্তি নষ্ট করে দেয়|যার ফলে আমি অলস হয়ে যাই। দেখুন, কী চমৎকারভাবে একটার পর একটা জোড়া! প্রথমে মনের চিন্তা ও দুঃখ, তারপর তা অক্ষমতা ও অলসতায় রূপ নেয়।

তৃতীয় জোড়া: ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখল..." আমি আশ্রয় চাই ভীরুতা (জুবন) এবং কৃপণতা (বুখল) থেকে। জুবন’ মানে ভীরুতা। এমন ভয়, যা আপনাকে মানুষের সামনে কিছু করতে দেয় না| যখন আপনি জানেন আল্লাহ তা’আলা কিছু ভালোবাসেন, আপনি জানেন এটা ফরজ| তবু আপনি করেন না, কারণ আপনি মানুষকে ভয় পান।

উদাহরণ:

আপনি স্পষ্ট দেখছেন কেউ ভুল করছে, কিন্তু আপনি কিছু বলছেন না। আপনি ভয় পান আপনার সন্তান কষ্ট পাবে, তাইও কিছু বলছেন না। আপনি ভয় পান বন্ধু বা সমাজ কী বলবে, তাই আল্লাহর হুকুমও এড়িয়ে যাচ্ছেন। তখন আপনি আল্লাহর সৃষ্টিকে ভয় পাচ্ছেন — অথচ সৃষ্টিকর্তাকে না! এটা ভীরুতার সবচেয়ে বাজে রূপ। তাহলে প্রশ্ন আসে যে –

"তাদের অনুভূতি কষ্ট না দিয়ে কীভাবে কিছু বলা যায়?"

আwg বলি, "তাদের অনুভূতি কষ্ট দেবে না এমনভাবে বলো।" তবুও, যদি সত্য বলা জরুরি হয়, তবে তা বলতে হবে। আর যদি আপনি ভয় পান — কী করবেন? আল্লাহর কাছে সাহস চান। আমাদের উম্মাহকে সেরা জাতি বানানোর অন্যতম কারণ কী?

“তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ থেকে বিরত রাখো।”

(তোমরা 'উম্মাতান ওয়াসাত্ব উত্তম জাতি)। এই গুণটি হারালে, আমরা আর শ্রেষ্ঠ জাতি নই।

নিজেদের দিকে তাকান — এখন আমাদের মাঝে কতজন সত্যিই অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে বা মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে?

কেন করি না? আমি যদি বলি, মানুষ কী ভাববে? তারা রেগে যাবে।" আমি তো একা কিছু বদলাতে পারব না। সবাই তো এমন করছে, আমি আলাদা কেন হব? এই ভয় আমাদের থামিয়ে রাখে।

উদাহরণ: কেউ বলে, কাল আমি রোযা রাখলে বেহুশ হয়ে যেতে পারি।"

প্রশ্ন করা হয়: "আপনি কি আগে কখনও বেহুশ হয়েছেন? না।"

তাহলে কেন ভয় পাচ্ছেন? এইসব ভয় — শয়তানের চাবি। শয়তান প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা 'চাবি' ব্যবহার করে। কখনও ভয়, কখনও অলসতা, কখনও সন্দেহ, ইত্যাদি। তবে ভয় যদি হয় — আল্লাহকে না খুশি করার ভয়, গুনাহ করার ভয়, কিংবা শাস্তির ভয় — তাহলে সেটা ভালো।

এই ভয় মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু ভয় যদি হয় মানুষের কাছ থেকে| " মানুষ কী বলবে, কী করবে"— তাহলে সেটা নেতিবাচক।

তখন দোয়া করতে হয়:

আল্লাহ, আমাকে এই নেতিবাচক ভয় থেকে রক্ষা করুন।

এরপর তিনি বলেন:"বুখল" (بُخل) — মানে কৃপণতা। এই কৃপণতা শুধু অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। অনেক মানুষ তো টাকাই পায় না — শুধু খাওয়ার সামান্য জিনিসে চলে। তাহলে তারা কীভাবে কৃপণ হবে?

কৃপণতা মানে — এমন আচরণ যেখানে আপনি সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু করেন না।

উদাহরণ: একটা প্রোগ্রামে আপনি ওপরতলায় আছেন। কেউ নতুন এসেছে, টয়লেট খুঁজছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু বলেন না। আপনি ভাবেন: "আমার কাজ না।" কেউ জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলেন: "ওটা ওখানে।"

আপনি সাহায্য করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। এটাই কৃপণতা।

আপনি উদার হতে পারেন শুধু টাকায় নয় — হাসিতে, সাহায্যে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, সহানুভূতিতে, এমনকি রেসিপিতে। মেয়েদের মধ্যে তো এটা খুব দেখা যায় — কেউ ভালো রেসিপি জানে, কিন্তু অন্যকে শেখাবে না। *"এইটা শুধু আমার স্পেশাল।"*

অথবা নিজের বাচ্চাকে শেখায়, কিন্তু অন্য কাউকে নয়। এটাই কৃপণতা।

আল্লাহ বলেন:

"যে ব্যক্তি নিজের কৃপণতা থেকে বাঁচতে পারে, সেই সফল।"

(সূরা হাশর: ৯)

আমাদের দোয়া করা দরকার:

“আল্লাহ, আমাকে নিজের কৃপণতা থেকে রক্ষা করুন।”

মানুষ স্বভাবতই কৃপণ — এটা আমাদের স্বভাব। এবং এই কথা কে বলেছেন? আল্লাহ নিজেই বলেছেন। স্বভাবতই আমরা এমন এক সৃষ্টি যারা জিনিসপত্র ধরে রাখতে ভালোবাসে। আপনার ওয়ারড্রোবের দিকে তাকান—যত কিছুই থাকুক, আপনি গত দশ বছরে তা গায়ে পর্যন্ত দেননি। আর যখন কেউ বলে এগুলো দান করে দিন, আপনি বলেন, না না, সামনে কোনো বিয়ে হবে, আমি দাওয়াত পাবো, তখন পরব।” বা আরও খারাপ, আপনি ওজন বেড়ে যাওয়ায় সেটি পড়তে পারছেন না, তবুও বলেন, আমি ওজন কমাবো, পরে পড়বো।” কখন সেটা হবে আপনি জানেন না, তবুও বলেন।” এটাই আমাদের অসুস্থতা, কারণ অনেক মানুষই খুবই প্রয়োজনে আছে। আপনি এই মনোভাব ঘরের সবকিছুর সাথে খাটাতে পারেন। আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে উদাহরণ দিলাম—জুতা হোক বা কাপড় বা রান্নাঘরের জিনিস, যেগুলো আপনি ব্যবহারই করেন না, এমনকি দরকারও নেই। তবুও আপনি তা রেখে দেন। আমাদের আল্লাহ্র নিকট দোয়া করা উচিত, যেন তিনি আমাদের এ মনোভাব থেকে রক্ষা করেন।

এখন দেখুন, কীভাবে সবকিছু একটার পর একটা ঘটে—প্রথমে আপনি এমন কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন হন যা এখনো ঘটেনি, এরপর আপনি দুঃখিত হন এমন কিছুর জন্য যা ঘটেছে এবং যা আপনার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তারপর আপনি ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েন—চাইলেও উঠতে পারেন না। এরপর, আপনি অভ্যন্তরীণভাবে অক্ষম হয়ে যান কিছু দিতে, সাহায্য করতে। কারণ, কাউকে কিছু দেওয়ার আগে আগে মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকতে হয়। এভাবে চিন্তা করুন, আপনি যদি আখিরাত নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে শক্তি দেবেন। আপনি কি কখনো ভাবেননি, রমজানে এই শক্তি কোথা থেকে আসে? এক কথায় বলি—এটা রমজান। আমরা বলি, "রমজান বলে এমন হচ্ছে।" কিন্তু আসলেই তাই। আপনি কুরআন পড়েন, সালাত পড়েন—সব কিছু একে একে করে ফেলেন। বাহ্যিকভাবে চাপ বেশি, কাজও বেশি। তবুও আপনি সব করে ফেলেন, কারণ তখন আপনার উদ্বেগ আখিরাতের জন্য। সুতরাং আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলান—উদ্বেগ থাকুক আখিরাতের জন্য, দুনিয়া সহজ হয়ে যাবে।

শেষের দুইটি অংশ হলো: ওয়াল-গালাবাতিদ-দাইন – ঋণের চাপে পিষ্ট হওয়া। এমন এক অবস্থা, যেখানে ঋণ এত বেশি হয়ে যায় যে আপনি মনে করেন আপনি তা পরিশোধ করতে পারবেন না। এমনও হতে পারে, ঋণ কম| কিন্তু যিনি সেই অর্থ আপনাকে

দিয়েছেন, তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দেন—সকাল-সন্ধ্যা বলেন, "আমার টাকা কই?" আপনি মানসিকভাবে এত চাপে পড়েন যে তা আপনাকে দমবন্ধ করে ফেলে।

ওয়াকাহর রিজাল – মানুষদের দ্বারা চাপে পড়া বা অত্যাচারিত হওয়া। বিশেষ করে যারা ঋণ দিয়েছে বা কোনো কিছু দাবি করছে, বারবার জিজ্ঞেস করছে। এটা মানুষকে মানসিকভাবে অসহায় করে তোলে।

আল্লাহ্ আমাদের এই অবস্থা থেকে রক্ষা করুন।

এটা কেমন অবস্থা! আপনি শুধু ভেতরে ভেতরে অস্থির হন তা-ই নয়, বরং আপনি এমন কিছু কাজও করে ফেলতে পারেন যা আল্লাহর অবাধ্যতা। হয়তো নিজেকে অপমানিত করবেন, হয়তো এমন কাজ করবেন যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়—শুধু ঋণ শোধ করতে। তখন আমি আল্লাহর সন্তুষ্টিও হারালাম।

এবং এখানে আমি কথা বলছি, আমাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় এই ঋণের মধ্যে পড়ি। তাই আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, যেন তিনি আমাকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করেন।

সবচেয়ে শেষের অংশ হলো—যখন আমি মানুষের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ি। এখানে 'পুরুষ' বলা হয়েছে, তবে আপনি এটা সবার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে পারেন—যখন আমি এতটাই ভয় পাই যে মানুষ আমাকে কষ্ট দেবে, ক্ষতি করবে, আমি মানুষকে খুশি করতে চাই। উদাহরণস্বরূপ—চাকরি করা মানুষ, যাদের বস আছেন। অনেক সময় বস এমন আচরণ করেন যে কর্মচারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। আবার, বস হয়তো কিছুই করেন না, কিন্তু ভয়টা আমার ভিতরে—যদি আমার চাকরি চলে যায়, বস “গুড মর্নিং” বলেননি, এর মানে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে! এসব চিন্তা আমাদের দুনিয়ার জন্য উদ্বিগ্ন করে তোলে।

তাই আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি—যেন তিনি আমাকে এই ধরনের অনুভূতি থেকে রক্ষা করেন।

সূরা তাওবার একটি আয়াত আছে, যা আমাকে ভীষণ স্পর্শ করে:

ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين

অর্থাৎ: "তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল, যদি তিনি আমাদের নিজ অনুগ্রহ থেকে দেন, তাহলে আমরা অবশ্যই সদকা দেবো এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো।"

এটা আমাদের জীবনের অনেক দোয়ার মতো—"হে আল্লাহ, যদি আপনি আমাকে সন্তান দেন, আমি এমন করবো; যদি ঐ কলেজে চান্স পাই, তাহলে এমন করবো; যদি ওই টাকা পাই, আমি সদকা করবো; যদি ওই বাড়ি পাই..." এইভাবে আমরা আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি করি।

কিন্তু যখন আল্লাহ তা দেন, তখন কী করি?

فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون

অর্থ: "যখন আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহ থেকে দিলেন, তখন তারা কৃপণতা করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো।"

এই চুক্তি ছিল আল্লাহর সঙ্গে! আর আল্লাহ তাদের কী শাস্তি দিলেন?

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون

অর্থ: "ফলে তিনি তাদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত নিফাক (কপটতা) সৃষ্টি করে দিলেন, কারণ তারা আল্লাহর সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যাবাদী ছিল।"

এই আয়াত খুবই ভয়ের—কারণ এটা বাহ্যিক শাস্তি নয়, এটা অন্তরের শাস্তি।

অতএব, আপনি যদি কোনো কিছু পাওয়ার আশায় আল্লাহর সঙ্গে কোনো চুক্তি করেন—ev ছোট একটি জিনিসের জন্য—আপনাকে তা পূরণ করতেই হবে।

এবং কুরআনে "বুখল" (কৃপণতা) কখনও ইতিবাচক অর্থে আসে না। সর্বদা এটি নিন্দার বিষয়।

সবশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস:

ما نقص مال من صدقة

অর্থ: সদকা দিলে সম্পদ কমে না।

আল্লাহ সাক্ষী থাকুন—আপনি বেশি দেন, আল্লাহও আপনাকে এমনভাবে দেন যা আপনি বুঝতেই পারবেন না! এটা শুধু টাকা নয়—যেমন, আপনি কোনো জিনিস পেতে চাচ্ছেন, হঠাৎ সেটা ডিসকাউন্টে চলে আসে। তখন ভাবেন, এটা কিভাবে হলো? কারণ আপনি সদকা দিয়েছিলেন। এটাই আল্লাহর দেয়া বরকত।

যদি আপনি কারো সাহায্য করেন|যেমন– ফোন করে জানান, তার কোনো ওষুধের প্রয়োজন, আপনি বললেন, "যেতে হবে না, চিন্তা করবেন না, আমি যাচ্ছি, আপনার জন্য নিয়ে আসব," এটা পুরোপুরি দানশীলতা। আল্লাহ আপনাকে এর পুরস্কার দেবেন, এটা নিশ্চিত। তবে, ভীরু হওয়া, মানুষের কাছ থেকে ভয় পাওয়া এবং কৃপণ হওয়া এক ধরনের নেতিবাচক চরিত্র এবং এটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এটা আমাদের শেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে—দোয়া এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকা। দোয়া কখনও একবারে নয়, বারবার করতে হবে। আল্লাহ একবার উত্তর না দিলেও, দোয়া করার পর পরিশ্রম করা উচিত, এর মানে হল যে আপনি বিশ্বাস রাখবেন যে আল্লাহ আপনার প্রয়োজন মেটাবেন, আপনার উদ্বেগ দূর করবেন, আপনার দুঃখ প্রশমিত করবেন, অথবা আপনি যেটা চাইছেন সেটা পাবেন। বিশেষ করে ঋণ বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মতো পরিস্থিতিতে এই দোয়া সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য।

এবং যখন আপনি মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত হন, কেউ এমন কিছু করছে যা আপনার জীবন কঠিন করে তুলছে, তখনও আপনি এই দোয়া পড়তে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন এবং বলবেন, "আমি মানুষ দ্বারা অভিভূত হওয়া থেকে রক্ষা চাই।"

এটা বলা হয় যে, সাহাবিরা (রাদ্বি) অনেক সময় হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। এক সাহাবি একবার বলেছিলেন, "আমি বিষণ্ণ," তখন তার প্রতিক্রিয়া ছিল, "আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, কারণ যখন আমি আল্লাহ থেকে দূরে থাকি, তখন আমি শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি।" এটা আমাদের শেখায় যে যখন আমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক হারাই, তখন আমাদের উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা বাড়তে পারে।

যখন আপনি আল্লাহর শান্তির কাছ থেকে দূরে থাকেন, তখন আপনি শান্তি অনুভব করতে পারবেন না, আপনি ভিতরে শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আপনি যদি আল্লাহর কাছে ফিরে যান, তবে আপনি শান্তি পাবেন। আল্লাহই একমাত্র "আস-সালাম," শান্তির উৎস, এবং তিনি একমাত্র, যিনি নিখুঁত শান্তি দিতে পারেন। এই সব কিছু অন্তর শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি পাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিদিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

সবরুন জামিল

আমরা যারা এই বরকতময় পৃথিবীতে বাস করি, আমাদের মনে রাখতে হবে এবং কৃতজ্ঞ থাকতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে।

আমি আপনাদের সাথে এখানে আলোচনা করবো ধৈর্যের—সুন্দর ধৈর্যের। আমরা সূরা ইউসুফ বেছে নিয়েছি| কিছু বিষয় আছে যেগুলো লক্ষ্য করতে হবে যখন আপনি কুরআনের কোনো সূরা পড়বেন—যেকোনো সূরা, ধরুন আপনি সূরাতুল বাকারা পড়ছেন বা আপনি নিজে কিছু পড়ছেন, এমনকি আপনি যদি কুরআনের শেষ সূরাটিই পড়েন। প্রথম যে জিনিসটি লক্ষ্য করতে হবে তা হলো—সুরার নাম। কেন এই নাম?

আমি আপনাকে অনেক প্রশ্ন করতে পারি এবং জানি আপনি কীভাবে উত্তর দিবেন। তবে চলুন একটা ছোট প্রশ্ন করি, যাতে আপনি গভীরভাবে ভাবেন। আমরা সূরা বাকারা থেকে কিছু শুনলাম, তাই বলি—আল্লাহ কেন এটাকে "বাকারা" নাম দিলেন?

সবাই বলবে, কারণ এতে গরুর (বাকারা) কাহিনী আছে, তাই তো? হ্যাঁ, এটা সবাই বলবে। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করবো, কেন এর নাম "সূরা মূসা" নয়? কারণ সূরাটির প্রথম ভাগে সবচেয়ে বেশি যাঁর কথা এসেছে, তা হলো মূসা আলাইহিস সালাম এবং বনি ইসরাইল। সূরার অর্ধেক অংশই তাঁর কাহিনী।

তাহলে কেন "সূরা মূসা" নয়? সূরা বাকারা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়—আল্লাহর আদেশের সাথে তর্ক করো না, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করো।

এখন চলুন সূরা ইউসুফে আসি।

প্রথমেই যখন আপনি এই সুরাটি খুলবেন—১২তম পারায়—তখন "ইউসুফ" নাম শুনে আপনার মাথায় কী আসে? এই নাম কী বার্তা দেয়?

অনেকগুলো বার্তা আসে। একটি হলো—সৌন্দর্য। ইউসুফ নাম বললেই প্রথমে সৌন্দর্য মাথায় আসে। আরেকটি হলো—পরীক্ষা। কিন্তু এটা কোনো সুন্দর পরীক্ষা নয়—বরং আরাম-আয়েশের মাধ্যমে পরীক্ষা।

কারণ পরীক্ষা দুই ধরণের হয়—আর আমাদের সবাইকে এটা মনে রাখা উচিত।

আমি এখন এই ঘরের মধ্যে বসে লিখছি —এখানে কোনো বোমাবর্ষণ নেই, বিদ্যুৎ আছে, তাপমাত্রা সুন্দর, পরিবেশ সুন্দর—তবুও আমরা পরীক্ষা দেওয়া অবস্থায় আছি। কারণ পরীক্ষা শুধু কষ্টের মাধ্যমেই হয় না—আর আল্লাহ এটা কুরআনে বলেছেন—

"তোমাদের আমরা ভালো এবং মন্দের মাধ্যমে পরীক্ষা করবো।"

যা গাজাবাসীদের উপর হচ্ছে, তা এক ধরণের পরীক্ষা। আর আমাদের উপর—আরাম, শান্তি, নিরাপত্তা, বিলাসিতা—এই সবকিছু দিয়েও পরীক্ষা হচ্ছে। তাই "ফিতনা"

(পরীক্ষা/বিপদ) মানেই হচ্ছে—তোমার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই তোমাকে ফিরতে হবে।

যখন আমরা "ইউসুফ" নামটা শুনি, বা সূরা ইউসুফ পড়ি, তখন প্রথমেই পরীক্ষার কথা মনে পড়ে। আর কী মনে পড়ে?

যখন আপনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্প পড়েন বা নামটাই শোনেন, তখন মনে আসে—তিনি কীভাবে পরীক্ষার জবাব দিয়েছেন? কীভাবে ধৈর্য ধরেছেন? এটাই হলো সূরা ইউসুফের মূল বার্তা।

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছিলেন| তিনি তাঁর চাচাকে হারিয়েছেন| তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-কে হারিয়েছেন, আর মক্কার লোকেরা তাঁকে নির্যাতন করছিলো—যেমন এখন গাজার মানুষদের সঙ্গে হচ্ছে।

এই সময়ে—এই গভীর বেদনার সময়ে—আল্লাহ সূরা ইউসুফ নাজিল করলেন।

এটাই কুরআনের একমাত্র সূরা যেখানে সম্পূর্ণ একটি কাহিনী একসাথে আছে। অন্য সব নবীর কাহিনিগুলো বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে|

তাই যখন আপনি সূরা ইউসুফ পড়বেন, আপনি বলবেন—"আচ্ছা, এটা নাজিল হয়েছিল কষ্টের সময়—তাহলে আল্লাহ আমাকে কিছু শিখাতে চাইছেন।"

সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—কষ্টের সময় কুরআন পড়ো। সূরা ইউসুফ পড়ো। এবং শুধু ইউসুফ (আ.) এর কাছ থেকেই নয়, এই কাহিনিতে অনেক কিছু আছে শেখার মতো।

যে কেউ কখনো কোনো গল্প বা বই লিখেছে, সে জানে—প্রতিটি গল্পে একটি মূল চরিত্র থাকে। কিন্তু সূরা ইউসুফে শুধু ইউসুফ (আ.)-এর কথাই নেই, এখানে অনেক PwiG আছেন। আমরা বলি ইউসুফ (আ.) মূল চরিত্র, ঠিক আছে।

তবে দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাঁর পিতা। এছাড়াও ২টি এমন চরিএ ছিলো যারা মানুষ নয়। স্বপ্ন। স্বপ্ন তাঁর জীবনে বিশাল ভূমিকা রেখেছে । সূরা ইউসুফে তিনটি স্বপ্ন রয়েছে| ইউসুফ (আ.)-এর নিজস্ব স্বপ্ন। জেলখানার দুই কয়েদির স্বপ্ন। রাজার স্বপ্ন। এই স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েই ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থান পাল্টে যায়—জেল থেকে রাজপ্রাসাদে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র? জামা (শার্ট)। জামা ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে একটি বড় পরিবর্তনের কারণ ছিল|

প্রথমে, ভাইয়েরা তাঁর জামা রক্তাক্ত করে বাবাকে দেখায়—প্রমাণ হিসেবে, যা দিয়ে তাঁরা মিথ্যে সাজায় যে ইউসুফকে বাঘ খেয়েছে। পরে, মন্ত্রীর স্ত্রী তাঁকে ফাঁসাতে চায় এবং তাঁর জামা টেনে ধরে, যার ফলে প্রমাণ হয় সে নির্দোষ।

সর্বশেষে, সেই জামাই ছিল, যা নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর অন্ধ পিতার কাছে, আর তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে।

তাহলে, শার্ট ছিল একটি "নিরব সাক্ষী", যা বারবার তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত ছিল। এই কাহিনি আমাদের কী শেখায়?

কুরআনের প্রতিটি বিষয়—শুধু মানুষ নয়—আপনার জীবনের প্রতিফলন। উদাহরণস্বরূপ: "আমি তো কোনো স্বপ্ন দেখিনি"—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী এমন কিছু পেয়েছেন যা আপনার জীবন বদলে দিয়েছে? "আমি তো ইউসুফ (আ.)-এর মতো জামা পরিনি"—ঠিক আছে, কিন্তু আপনার জীবনে কি এমন কোনো জিনিস আছে যা আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এবং যা আপনার জীবনে বড় ভূমিকা রাখছে?

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যা মানুষ নয়—তা হলো অনুভূতি|

অনুভূতিগুলো ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। যেমন:

ভালোবাসা , বাবার অতিরিক্ত ভালোবাসা ভাইদের মধ্যে হিংসা তৈরি করলো। হিংসা জন্ম দিল ষড়যন্ত্র ও ঘৃণা | পরে আমরা দেখি লালসা, যা মন্ত্রীর স্ত্রীর আচরণে দেখা যায়। আবার বাবার দুঃখ, আশা এবং ধৈর্য এসবই ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের অংশ।

তাই এই সূরা আমাদের বলে: কুরআন শুধু গল্প নয়, এটা আমার ও আপনার জীবনের প্রতিচ্ছবি।

আমি কিসে পরীক্ষা দিচ্ছি? আমার জীবনে "স্বপ্ন" আর "জামা" কী?

ইউসুফ (আ.) এর ঘটনাগুলো আমরা দেখি ভালোভাবে–"কূপে না ফেললে তিনি দাস হতেন না, দাস না হলে মন্ত্রীর ঘরে পৌঁছাতেন না, আর মন্ত্রীর ঘরে না গেলে দ্বিতীয় 'ভালোবাসা'র ঘটনা ঘটত না।"

তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে, একটা অনুভূতি থেকে আরেকটা অনুভূতি—এভাবে পুরো জীবন প্রবাহিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো—পরবর্তী অনুভূতিটি কী ছিল?

প্রথম ছিল ভালোবাসা (বাবার), এরপর হিংসা (ভাইদের), তারপর আবার ভালোবাসা ও লালসা (মন্ত্রীর স্ত্রীর), এবার আসে নতুন একটা অনুভূতি: রাগ |

তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছিল—কেন? কারণ তিনি আল্লাহর বিধান ভাঙতে চাননি| তখন মন্ত্রীর স্ত্রী রেগে গিয়েছিলেন| কেননা ইউসুফ (আ.) তাঁর অনুরোধ মেনে নেননি। এই রাগ, আর তার পেছনের অহংকারই ছিল মূল চালক। তার পরিণতি—জেল।

এই গল্প আমাদের কী শেখায়?

প্রতিটি অনুভূতির পরিণতি রয়েছে। ভালোবাসা, হিংসা, রাগ, অহংকার, ঈর্ষা—সবকিছু আমাদের জীবন বদলে দেয়। তা যদি নিয়ন্ত্রণ না করি, তবে তা আমাকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে। আবার সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে তা আমাকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।

সবাই যখন তাদের অনুভূতির শিকার হয়ে চলছিল (ভাইদের হিংসা, স্ত্রীর লালসা, নারীদের বিস্ময়), তখন ইউসুফ (আ.)-এর অনুভূতি ছিল স্থির।

তাঁর হৃদয়ের অবস্থা কী ছিল? আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ| যখন তাঁকে প্রলোভনে ফেলা হয়, তিনি তখনই বললেন:

"আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি।"

এটি তাঁর অনুভূতি ছিল| একটা ঈমানদার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। আর এটা কেই বলে সবরুন জামিল। তিনি ভয় পাননি মানুষকে, ভয় পেয়েছিলেন আল্লাহকে হারানোর। এটি সত্যিকারের "তাকওয়া"।

অনুভূতি, আবেগ, প্রেম, হিংসা, রাগ—সবই মানুষের জীবনের অংশ। কিন্তু আমি যদি সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি, সেগুলোই আমার কবর রচনা করতে পারে। আর যদি আমি তা আল্লাহর পথে ব্যবহার করি, সেগুলোই আমার জান্নাতের পথ খুলে দিতে পারে।

যখন ইউসুফ (আ.) এর অনুভূতিগুলোর পরীক্ষা হলো, যখন সে তার ভাইদের দেখলো—আমি সবসময় সেই দৃশ্যটি অনুভব করতে চাই। তারা আমাকে কষ্ট দিয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। বলা হয়, তার বয়স তখন ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে ছিল। তাদের কারণে আমি এতিম হলাম, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, অন্তত ৪০ দিন কূপে ছিলাম, যেখানে ছিলো বিচ্ছু আর সাপ। পরে আমাকে দাস বানানো হলো, তারপর জেলে পাঠানো হলো—আমি কিছুই করিনি। এবং এখন তারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আর আমি ক্ষমতার অবস্থানে আছি—তখন আমি কী করবো? আমার ভিতরে কী অনুভূতি আসবে? আর আল্লাহ সেই অনুভূতির কথা বলেছেন, যখন তারা সবাই তার সামনে উপস্থিত হয়, তখন সে তাদের চিনে ফেলেছিল। আল্লাহ আমাদের বলেন, সে তাদের চিনেছিল।

এই দৃশ্য কল্পনা করুন—আপনার জীবনে কেউ এসেছে, যিনি আপনার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছেন, চাকরি কেড়ে নিয়েছেন, পরিবার বিচ্ছিন্ন করেছেন, ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। এখন আপনি শক্তিশালী অবস্থানে আছেন, আর তারা আপনার সামনে এসেছে—আপনার কী অনুভূতি হবে?

প্রথম অনুভূতি—রাগ। আমরা তো বলি, অপেক্ষা করো, এবার দেখো আমি কী করি।"

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) কী করলেন? কিছুই না। এমনকি যখন তারা দ্বিতীয়বার এলো, যখন তিনি ছোট ভাইকে রাখতে চাইলেন| তখন ইউসুফ আ. এর লোকেরা বললো, তোমরা চোর!" আর যখন প্রমাণিত হলো, তারা সত্যিই চোর, তখন তারা বললো, ও তো চুরি করবেই, তার ভাইও এক সময় চুরি করেছিল।" ৪০ বছর পরেও তারা ঈর্ষান্বিত তার প্রতি। তখন আপনি কী করতেন? হয়তো সবাইকে জেলে পাঠাতেন, অথবা বলতেন, তোমাদের কি এখনও হুঁশ হয়নি?

এমনটা করা কি অন্যায় হতো? না, একদমই না। ইসলামেও বলা হয়েছে, কেউ আপনাকে কষ্ট দিলে আপনি তাকে সমান কষ্ট দিতে পারেন। কুরআনেই আছে—"যেভাবে আঘাত করা হয়েছে, আপনি সেভাবেই জবাব দিতে পারেন।" এটি হচ্ছে ন্যায়বিচার।

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) কী করলেন? কী অনুভব করলেন? তিনি সেটা নিজের ভেতরেই রাখলেন। কাউকে কিছু বললেন না। শুধু নিজের সাথে কথা বললেন—"তারা তোমার চেয়েও খারাপ, আর আল্লাহ তোমাকে বিজয় দিবেন।"

আমাদের মধ্যে কতজন এটা করতে পারতাম?

এই অনুভূতির মধ্যে প্রেম আছে, ঘৃণা আছে, ঈর্ষা আছে। কিন্তু যখন আপনি সেগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করেন—যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে—এটাই হচ্ছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ।

এটা এমন একটি মুহূর্ত, যেখানে পরিস্থিতি মানুষের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তারপরও আল্লাহর সাথে সংযোগ বজায় থাকে—আপনি বলেন ও করেন, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। প্রতিবার আমি এটি পড়ি, আমি থেমে যাই এবং বলি, হে আল্লাহ, আপনি হযরত ইউসুফকে যা দিয়েছেন, আমাকেও তা দিন, আর আমাকে এমন কিছু বলতে দিন, যা তিনি বলেছিলেন।"

এই ঘটনা গল্পের শেষ অংশে আসে, কিন্তু সুরার শেষ না। এখন একটি বার্তা আসছে| আপনারা সবাই জানেন, তিনি এখন শাসক। এখন তারা আবার আসে—তার পিতা, ভাইরা সবাই। কল্পনা করুন এই দৃশ্য—আপনি একজন গভর্নর, রাজকীয় সাজে বসে আছেন। তারা প্রবেশ করছে। কারা? ভাইরা, পিতা-মাতা।

তিনি কী বললেন? কল্পনা করুন আপনি হলে কী বলতেন? প্রথমেই কিছু কষ্টের কথা বলতেন, না? না, তিনি বলেননি, দেখো, আমি তো বলেছিলাম।" বরং বলেন, এসো, মিশরে এসো, এখানে নিরাপদ থাকবে।" না কোনো প্রতিশোধ, না কোনো দম্ভ। এবং এটাই আমাদের জন্য শিক্ষা।

তার পিতা ও মাকে সিংহাসনের পাশে বসালেন, এবং এটা ইসলামের আগের সময়, যখন আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা বৈধ ছিল —তারা সবাই তাকে সিজদা করলো। তখন সে বলল, আব্বা! আপনি কি মনে করেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে স্বপ্নটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?সে বলল, আব্বা! এটাই আমার স্বপ্নের বাস্তবতা—আমার রব এটি সত্যে পরিণত করেছেন।" এখন দেখুন, সে আল্লাহর সাথে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

সে বলছে, আমার রব আমার স্বপ্ন সত্য করেছেন।" তারপর সে আল্লাহর সাথে কথা বলছে, তিনি আমাকে কত ভালোভাবে দেখাশোনা করেছেন"—তাকে কূপে ফেলা হয়েছিল, দাস বানানো হয়েছিল, জেলে রাখা হয়েছিল। তবুও সে বলছে, তিনি আমাকে কত ভালোভাবে দেখেছেন।"

আলেমগণ বলেন, সে তার কষ্টের কিছুই উল্লেখ করেনি। সে শুধু আল্লাহর দেওয়া কল্যাণের কথাই বলেছে। সে বলেনি, আল্লাহ আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন,বা "আমার জীবন বরবাদ হয়েছিল।" বরং সে বলেছে, তিনি আমাকে জেল থেকে বের করে এনেছেন।"

তারপর সে তার ভাইদের উদ্দেশে বললো, তিনি তোমাদের সবাইকে দূর থেকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন।" মনে রাখবেন, তারা তো কিছুই করেনি, তার উপর ষড়যন্ত্র করেছিল। এরপর সে বলছে, নিশ্চয়ই আমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

আমাদের মধ্যে কতজন মানুষ আছে, যাদের জীবনে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে—চাকরি পেয়েছেন, বাড়ি কিনেছেন, পরিবারে শান্তি—তবুও তারা আল্লাহর দিকে ফিরে যায়? কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) যান। তার উপর কিছুই প্রভাব ফেলেনি।

কুরআনের সবচেয়ে সুন্দর দোয়াগুলোর একটি। সে আল্লাহর দিকে ফিরে বলছে, হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজত্ব দিয়েছেন, আপনি আমাকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান শিখিয়েছেন। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক।"

এরপর সে যা চাওয়ার , তা চায়। এটিই দোয়ার আদব—আল্লাহর প্রশংসা, তারপর চাওয়া। সে বলছে, আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন, এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে একত্রিত করুন।" সে বলেনি, আমি সৎকর্মশীল।" বরং সে বলছে, আমাকে তাদের সঙ্গী করুন।"

তারপর আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর দিকে ফিরে বলেন, এটি আমরা তোমাকে গায়বের খবর জানাচ্ছি। এরপর আল্লাহ বলেন, যখন নবীগণ হতাশ হয়ে পড়েন, তখনই আমার

সাহায্য আসে। আমাদের জীবনেও যখন আমরা ভেঙে পড়ি, মনে হয় সব শেষ—তখনই আল্লাহর সাহায্য আসে।

আল্লাহ সাথে সাথেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য সাহায্য পাঠাতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন সে ধাপে ধাপে পরীক্ষা দিক, কারণ এই পরীক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ মানুষকে গড়ে তোলেন।

এবং এই সুরার শেষ আয়াত বলছে, কুরআনের এই গল্পগুলো শুধুমাত্র গল্প নয়। এটা শিক্ষা, যা বুদ্ধিমানদের জন্য উপকারি, যারা চিন্তা করে, উপলব্ধি করে। এটি নিরর্থক কথা নয়। এটি স্মরণিকা, যা আমাদের মনে রাখা উচিত।

আমরা যেসব কঠিন সময় পার করছি, কুরআন আমাদের শেখায়, আমরা একা নই। আমাদের আগেও মানুষ পরীক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, আমাদের পরেও যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের কোরআন পাঠ করার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন, যেন আমরা পাঠ করে চিন্তা করি, যেন কোরআন আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনে—শুধু সওয়াব অর্জনের জন্য পাঠ না করি।

ইমান , আমল , ইখলাসে গড়া

আমার চিরস্থায়ী আবাস

আমরা পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে এতটুকু জেনেছি বিশুদ্ধ হৃদয় বলতে কি বোঝায় এবং কীভাবে একটি বিশুদ্ধ হৃদয় অর্জন করা যায় আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আমরা বিশুদ্ধ হৃদয় সর্ম্পকে আর একটু বিস্তারিত জানবো ইন শা আল্লাহ।

শুরুতেই দুইটি প্রশ্ন পাঠকের উদ্দেশ্যে যাতে আমরা চিন্তনশীল হতে পারি। দুইটি প্রশ্ন হলো।

১. আপনার কি একটি বিশুদ্ধ হৃদয় আছে?

২. বিশুদ্ধ হৃদয় বলতে কী বোঝায়?

এটি দুই ভাগে বিভক্ত—যদি আমার একটি বিশুদ্ধ হৃদয় থাকে (ইনশাআল্লাহ আমরা রাখি), তাহলে আমি কীভাবে তা অর্জন করলাম? আর যদি না থাকে, বা হয়তো অর্ধেক, বা তারও কম, তাহলে আমি কী করতে পারি?

আমরা কেন বিশুদ্ধ হৃদয়ের ওপর এত গুরুত্ব দিই? এটি আসলেই এসেছে কোথা থেকে? সবকিছু অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে| তবে এটি আমাদের কাছে কিভাবে এসেছে?

"বিশুদ্ধ হৃদয়", "সুস্থ হৃদয়", "সাবলীল হৃদয়"—অনুবাদের উপর নির্ভর করে যেটাই বলি না কেন|এই শব্দটি কুরআনে এসেছে। এটি মূলত কুরআনের দুটি জায়গায় উল্লেখ আছে| দু'টিই নবী ইবরাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এক জায়গায় তিনি দোয়া করেছেন যেন তার এমন একটি হৃদয় থাকে, আর অন্য জায়গায় আল্লাহ তার বর্ণনা দিয়েছেন যে তিনি একটি "সালিম" (বিশুদ্ধ) হৃদয় নিয়ে আল্লাহর সামনে এসেছেন।

প্রথমটি এসেছে সূরা আশ-শু'আরÑ

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

এবং পূনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না| যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না| কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। (87 , 88 , 89)

তিনি কিয়ামতের দিন বলেননি, বরং বর্ণনা করেছেন সে দিনের বৈশিষ্ট্য—যা উপকারে আসবে না। আমরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর অবাধ্য হই মূলত এই দুইটির কারণে—সন্তান এবং সম্পদ।

তিনি (নবী ইবরাহিম আঃ) আল্লাহকে বলছেন- না সম্পদ, না সন্তান—কিছুই উপকারে আসবে না।" তাহলে কী উপকারে আসবে? এরপরই তিনি বলেন—"ছাড়া"। আর এই "ছাড়া" বা "ইল্লা" শব্দটি আরবিতে একটি বিশেষ ভাষাগত কাঠামো, যার মানে হলো—এর পর যেটা আসছে, সেটিই একমাত্র ব্যতিক্রম, আর আগে যা কিছু বলা হয়েছে, সেগুলোর কিছুই কার্যকর হবে না।

আর সেই ব্যতিক্রম কী? যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আসে।" সেই বিশুদ্ধ বা সালিম হৃদয়ই হচ্ছে আমার এবং আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

আপনি জান্নাতে যেতে চান? অবশ্যই আমি জান্নাতে যেতে চাই। দুনিয়াটা তো সাময়িক, কতদিনই বা এখানে থাকব? আমি তো সেখানে থাকতে চাই, আমি চাই আল্লাহর প্রতিবেশী হতে, আমি আল্লাহকে দেখতে চাই, এমন এক জায়গায় থাকতে চাই যেখানে দুঃখ নেই, চিন্তা নেই, ব্যথা নেই। খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে না, খাবার কোথা থেকে আসবে সেটা ভাবতে হবে না। আমি থাকব এক অসীম আনন্দ ও বরকতের ভেতর—যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে।

কিন্তু আমাকে এখন কী করতে হবে?

শুধু একটাতেই মনোযোগ দিন| আমার হৃদয় নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের সবারই প্রশ্ন—"আমাকে কী করতে হবে? সালাত, রোজা, দান, সাদকাহ—সবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এগুলো সব মিলেই আমার হৃদয়কে বিশুদ্ধ করার উপায়।

ভাবুন– একটি বড় লেক আছে, এবং সেখানে বিভিন্ন নদী এসে মিশছে। যত বেশি নদী আসবে, লেক তত বড় ও বিশুদ্ধ হবে। এই লেকই হচ্ছে হৃদয়। আর নদীগুলো হলো—আল্লাহ যা করতে বলেছেন, সেই সব কাজ। যত বেশি ভালো কাজ করব, তত বিশুদ্ধ হবে আমার হৃদয়।

কিন্তু এখানে একটা বড় ভুল আমরা করি—আমাদের যা করতে মানা করা হয়েছে, সেদিকে কম মনোযোগ দিই। অথচ, এগুলোও লেকেরই অংশ। আমি যদি নামাজ পড়ি, অনেক সুন্দরভাবে পড়ি—এটা একটা ভালো নদী। কিন্তু আমি যদি মিথ্যা বলি, কারো বদনাম করি, নির্দয় হই—তাহলে এটা সেই লেককে অপবিত্র করে। শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন সবকিছুর বিচার হবে ওজনের স্কেলে—যাকে কুরআনে বলা হয়েছে "মীযান"।

যার পাল্লা ভারী হবে, সে সফল। কী আমার পাল্লাকে ভারী করবে? আমার ভালো কাজগুলো। কিন্তু খারাপ কাজগুলো সেই ওজনকে হালকা করে দেবে।

তাই হৃদয়কে বিশুদ্ধ করা মানে—প্রতিটি ভালো কাজকে সেই লেকে পৌঁছানো, আর খারাপ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা। আর এই পথে আমি যদি একাই হই, তবুও চলব। আমি একা জানলেও নিশ্চিত যে এটি আল্লাহর চাওয়া, আমি একাই সে নদীর মতো হতে চাই—যা হয়তো অনেক ছোট, কিন্তু ওজনের দিক থেকে হাজারো লোকের ভুলপথে চলার চেয়ে বেশি ভারী।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায়, এবং তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে যেমনটি শুরু হয়েছিল। অতএব, গুরাবা (অপরিচিতদের) জন্য শুভ সংবাদ। (সহীহ মুসলিম: 145)

মক্কায় দাওয়াতের শুরুতে কতজন মুসলিম ছিল? মদিনায় প্রথম 'বাইআত'-এর সময় ছিল মাত্র ৭০ জন। আর বিদায় হজে ছিল ১ লাখ।

এবার হজ্বে এসেছে ১৯ লাখ মানুষ। এই দ্বীন আবারও অপরিচিত হয়ে ফিরে আসবে। রাস্তায় হাঁটুন দেখুন —সব মুসলিম নারী কি আল্লাহর সন্তুষ্টিমতো পোশাক পরছেন? সব মুসলিম কি তাঁর কাজ ও আচরণে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করছেন?

আমি সেই অপরিচিত হতে চাই, যে প্রতিটি ধাপে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই চলবে। নির্বাচন করে নয়। এমন নয় যে—আজ দ্বীনী পরিবেশে আছি বলে আমি আদর্শ মুসলিম, আর কাল কাজে বা বাজারে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ!

আবারও মনে করুন—নদীগুলোর কথা।

আল্লাহ আমাকে যেখানেই রাখুন না কেন—স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, আত্মীয় হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে—সব জায়গায় তিনি আমাকে সেই দায়িত্ব পালনকারী বানাতে চান।

এখন এই কথাগুলো একসাথে মিলিয়ে দেখুন| আপনি যদি সেই 'অপরিচিত' ব্যক্তি হন তাহলে আপনার মুখ থেকে কখনোই এই কথা বের হবে না—'সবাই তো করছে, এতে এমন কী হয়েছে?

আল্লাহ তো অবশ্যই ক্ষমাশীল, অবশ্যই দয়ালু। যদি তিনি না হতেন, আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম না। যদি তিনি না হতেন, আমরা কেউ এখানে থাকতাম না—কারণ আমরা কেউই তাঁর রহমতের উপযুক্ত নই। কিন্তু তবুও, আপনাকে হতে হবে সেই একনিষ্ঠ ব্যক্তি। এবং প্রথম ধাপটি খুব সহজ মনে হলেও বাস্তবে আমাদের অনেকের জন্য তা অত্যন্ত কঠিন। আর সেটি হলো—'ইখলাস' বা একনিষ্ঠতা।

আপনি যা কিছুই করেন, যা কিছুই ছেড়ে দেন, যা কিছুই বলেন, সবকিছুই যেন হয় শুধুমাত্র একমাত্র তাঁর (আল্লাহর) জন্য।

এই দ্বীনের মূল কথাই হলো—'ইখলাস'। আপনি যেকোনো তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির বই পড়বেন, তারা প্রথমেই বলবে—আল্লাহর সাথে হৃদয়ের সংযোগ গড়তে চাইলে, আপনার প্রথম কাজ হলো—একনিষ্ঠ হওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি চমৎকার হাদীসে বলেন:

"আমি আল্লাহ, আমি কারও কোনো অংশীদারিত্বের প্রয়োজন অনুভব করি না। কেউ যদি আমার সাথে অংশীদার স্থির করে, আমি তাকে তার সেই অংশীদারের সাথেই ছেড়ে দিব।"

আপনি যখন বলেন—"আমি এটা করতে পারি", আমি পরিকল্পনা করেছি", আমি পরিশ্রম করেছি", আমি তিন-চার বছর ধরে চেষ্টা করেছি"—আর এর মাঝে আল্লাহর কোনো উল্লেখ নেই, তখন বুঝে নিন, আপনি ভুল পথে।

আল্লাহ আপনাকে সেই ভাবনা দিয়েছেন, তিনি সহযোগীদের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি আপনাকে শক্তি দিয়েছেন, আপনাকে চালিয়ে গেছেন, এমনকি আপনি ব্যর্থ হলেও—এই সবকিছু তাঁরই দান।

যদি আপনার কথায়, কাজে, পরিকল্পনায় আল্লাহর কোনো স্থান না থাকে—তাহলে স্মরণ রাখুন, তিনি আপনাকে ছেড়ে দিবেন, এমনকি আপনি সফল হলেও।

কারণ, কখনো কখনো আল্লাহ আমাদের , আমাদের চাওয়া জিনিসটা দিয়ে দেন, যদিও আমরা গুনাহগার| এটা তাঁর দয়ালু স্বভাব। তাই, আপনি যাই করুন, সেটা যেন হয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম ——আপনি বিয়ে করতে চান কেনো? তখন আপনার উওর কি হবে?

সবাই তো বিয়ে করছে, আমি এই মানুষটিকে ভালোবাসি—এটাই উত্তর। কিন্তু এগুলো আল্লাহর জন্য নয়।

আপনার এই পথচলার শুরুতে, আপনি যখন ঠিক করলেন—আমি আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাব, আমি চাই যেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় আমি প্রস্তুত থাকি—আপনি হয়ত লক্ষ্য অর্জন করেছেন, হয়ত পথেই আছেন, তবুও আল্লাহ যদি আপনাকে নিয়ে যান, তিনি আপনাকে সেই লক্ষ্য অর্জনকারী হিসেবেই গণ্য করবেন।

কারণ, আল্লাহ কুরআনে বলেন—

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হিজরত করে, তারপর মৃত্যু তাকে পাকড়াও করে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে।"

অর্থাৎ, আপনি যদি আল্লাহর জন্য আপনার পরিবেশ বদলান—যেমন, আপনি এমন জায়গায় চলে গেলেন যেখানে ইসলাম চর্চা করা সহজ, হিজরত করলেন—তাহলেই আপনি আল্লাহর পথে আছেন।

আজও, প্রতিদিনই আমাদের সেই হিজরতের দরকার।"

আমরা হিজরত করছি তার উদাহরণ হলো– তুমি একটি অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করতে| এতটাই ভালোবাসতে যে সেটার প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলে। তারপর তুমি জানতে পারলে এই অনুষ্ঠানটি তোমাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তোমার হৃদয়ের সেই লেকের পথ আরও বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, তাই তুমি সিদ্ধান্ত নিলে আর দেখবে না—তুমি হিজরত করলে। তুমি গুনাহ থেকে আনুগত্যের দিকে হিজরত করলে। কিন্তু অবশ্যই সেই হিজরতের পেছনে তিনটি শব্দ থাকা লাগবে: "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।" হিজরতটা হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য।

এবং তোমাকে সৎ হতে হবে। যদি তুমি সৎ না হও, তবে সেটা কোনো কাজে আসবে না। কারণ আল্লাহ জানেন| জানেন এমন কিছুও যা এখনো গোপন।

তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা ছেড়ে দিলে, তুমি সেই বন্ধুদের ছেড়ে দিলে যাদের সাথে থাকলে তুমি গীবত করতে বাধ্য হতে| তুমি এখন তাদের সাথে বের হও না, যদিও তুমি তা উপভোগ করতে, ভালো লাগত| তুমি এটা ছেড়ে দিলে কেন? কারণ এটা আল্লাহর অবাধ্যতা। কী ঘটবে এরপর? তুমি এই দুনিয়াতে অনেক সুযোগ, অনেক দান, অনেক প্রশস্ততা দেখবে।

তারপর তুমি তোমার ঘর ছেড়ে দিলে—এটা হলো শারীরিক হিজরত। আমি যেসব উদাহরণ দিয়েছি, সেগুলোর মতো। তারপর তুমি মারা গেলে—তুমি এখনো শেষ অবধি পৌঁছাওনি, কেবল শুরু করেছিলে মাত্র, একটা জিনিস মাত্র ছেড়েছিলে। কী হবে তখন? আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ হিজরতের সওয়াব দান করবেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

তাই, প্রিয় পাঠক এই সফর শুরু করার প্রথম ধাপ হলো—তোমার প্রতিটি কাজ বিশ্লেষণ করা শুরু করো। ভিতরটা দেখা শুরু করো, নিজের সাথে কথা বলো, আর আল্লাহর সাথে কথোপকথন শুরু করো: "আমি এটা করছি তোমার জন্য এবং কেবল তোমার জন্য।" এবং আল্লাহর কাছে বলো: "যদি মাঝপথে আমার নিয়ত পরিবর্তন হয়, তবে আমাকে ফিরিয়ে দাও, টেনে আনো, আমাকে মনে করিয়ে দাও।" কারণ আমরা এটা

করি—লোকজন আমাদের প্রশংসা করতে থাকে, আমরাও একে অপরকে প্রশংসা করি—অকারণে। তারপর ভিতরে ভিতরে সেটা ভালো লাগতে শুরু করে, এবং আমরা সেই কাজটা করি যাতে মানুষ প্রশংসা করে। তখন ইখলাস চলে যায়। তখন যা করছো, সেটা আর আল্লাহর জন্য নয়।

তোমার প্রতিটি কাজ কেবল তাঁর জন্য হতে হবে—এবং তিনিই তোমাকে পরীক্ষা করবেন, প্রতিবার। এটা সত্যিকারের ইখলাস, না কেবল দাবী।

তাহলে শুরুটা কী? সেই লেকটি কল্পনা করো—যেখানে কিছুই নেই, শুধুই আল্লাহ আছে। মাছ নেই, গাছ নেই, পাতা নেই, নৌকা নেই, কেউ সাঁতার কাটছে না—কিছুই না। শান্ত, পরিষ্কার, সুন্দর। সেটাই হৃদয়। আল্লাহ ছাড়া কোনো বন্ধন নেই।

যদি আমার সৌন্দর্য আমাকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়, আমি তা চাই না। যদি আমার স্বামী, সন্তান, চাকরি বা বাড়ি আমাকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়, আমি তা চাই না। এমন কাউকে, যেই আমাকে তোমার থেকে দূরে নেয়—আমি তাকে চাই না, হে আল্লাহ!

সুতরাং, প্রথম ধাপ—ইখলাস শেখো। তাসাউফের বইগুলোতে একটা বিখ্যাত গল্প আছে। এতে বলা হয়, এক ব্যক্তি ৪০ বছর মসজিদের প্রথম কাতারে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়েছিলেন। একদিন, তিনি দেরি করে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর মনে এলো—“আজ মানুষ আমাকে দ্বিতীয় কাতারে দেখবে।”

সালাত শেষে, তিনি নিজেকে বললেন: “ধিক তোমার ওপর! তুমি ৪০ বছর প্রথম কাতারে দাঁড়িয়েছিলে কেবল মানুষ যেন দেখে তুমি প্রথম কাতারে দাঁড়াও।” সেই ৪০ বছর নষ্ট হয়ে গেলো। কারণ আল্লাহ শরিক পছন্দ করেন না।

আমরা যখন কাজ করি দেখানোর জন্য, প্রশংসা পাওয়ার জন্য, সেটা বুঝা যায় খুব সাধারণভাবে—যখন কেউ প্রশংসা না করলে তুমি মন খারাপ করো। যেমন-তুমি কিছু রান্না করলে, টেবিলে রাখলে, বাচ্চারা খেয়ে চলে গেল, কিছু বলল না। তুমি বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকলে—“কেমন হয়েছে? তাহলে বুঝে নাও, তুমি রান্নাটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করোনি। আপনি যা কিছু অন্যদের জন্য করেন, তা শুধু সন্তানদের জন্য নয়, বরং যেকোনো মানুষের জন্য। আপনি যদি কাউকে সাহায্য করেন আর সে যদি আপনাকে ধন্যবাদ না দেয়, আপনি খুব ভালো করেছেন’ না বলে, তখন কি আপনি কষ্ট পান? ইসলাম অবশ্যই আমাকে শেখায় এসব কথা বলা উচিত। কারণ যে মানুষ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়—এটা সত্য এবং ইসলামের আদবের অংশ। কিন্তু আমি যদি শুধু এজন্য করি, তাহলে আমি ভুল করছি।

সত্যনিষ্ঠতা (إخلاص)—রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলÑআপনি কী বলবেন তার ব্যাপারে, যে জিহাদে গিয়েছিল আল্লাহর জন্য, কিন্তু চেয়েছিল মানুষ তাকে সাহসী বলে মনে করুক?তার কী পুরস্কার হবে?তিনি বললেন-কিছুই না।" কিছুই না! সে জিহাদে গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের প্রশংসা চেয়েছিল। সে আল্লাহর সঙ্গে একBসঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করেছে।

এই দ্বীন ভিত্তি করে রাখা হয়েছে তাওহীদ-এর ওপর। যখন একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে, তখন প্রথম তাকে কী বলা হয়? শাহাদা দাও। শাহাদা কী? আমরা সবাই জানি, দিনে কমপক্ষে পাঁচবার নয়, দশবার বলি। কিন্তু আমরা জানি না আমরা কী বলছি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। আমরা আঙুল উঠিয়ে বলি—দশটি আঙুলের মধ্যে কেন একটি? কারণ আমরা বলি—তুমি একমাত্র, হে আল্লাহ, এবং সবকিছু তোমার নিচে। আমি এটা বলছি, কিন্তু আমার বাস্তব জীবনে!! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন—অধিকাংশ কিছুই এই 'একটির' ওপরে? আমি সালাত দেরি করি কারণ আমি ফোনে ব্যস্ত। আযান শুনি কিন্তু কথা বলা থামাই না, কারণ আমি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি।

সুতরাং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমাদের সকলের এই লক্ষ্যটি থাকতে হবে, তা কোনভাবেই ঐচ্ছিক নয়। আমি এটা নিজেকে বলি, কারণ আমি জান্নাতে যেতে চাই, এবং আমাদের সকলেরই জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে। আমাদের এই ইচ্ছা থাকতে হবে, কারণ জান্নাতে যা আছে তা কেউ কখনো দেখেনি, কেউ কখনো শোনেনি, এবং পরবর্তী দিকটি হলো, জান্নাতে যা কিছু আছে তা এমন এক পরিস্থিতি, যা আপনার মনের কোন ভাবনায়ও আসতে পারে না। আমি যখনই সৌন্দর্য দেখি, সুন্দর দৃশ্য দেখি, আমি বলি, "ইয়া আল্লাহ, এর চেয়ে আরও সুন্দর কি হতে পারে?" এবং হাদিসটি মনে আসে, *"আপনি চিন্তা করতে পারবেন না বা কল্পনাও করতে পারবেন না, তা কেমন দেখাবে।"*

এক বেদুইন এসে প্রশ্ন করেছিলেন, কিয়ামতের দিন কখন আসবে? আমাকে একটা সময় দিন যাতে আমি পরিকল্পনা করতে পারি। দেখুন, তিনি কী উত্তর দিয়েছেন| তিনি বললেন, *"আপনি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছেন?"* এই প্রশ্ন আমাদের সবার জন্যও । আপনি কি প্রস্তুতি নিয়েছেন আপনার জন্য?

আপনি যখন কোথাও যাওয়ার উদ্দেশে¨ আপনার সুটকেস ¸ছান কখনও কখনও আপনি একটি তালিকা তৈরি করেন যাতে কিছু ভুলে না যান এবং আপনি দেখতে শুরু করেন, "আপনি কি প্রস্তুতি নিয়েছেন?"

আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল যা আপনি আপনার জীবনের জন্য প্যাক করবেন তা হলো সৎতা (ইখলাস)। বিষয়টি সুবহানাল্লাহ এবং এটি আলেমরা বলেছেন, আমি না। তিনি বলেছেন, এই ধর্মের সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো সৎ হওয়া এবং তিনি কেন বলেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেছেন, কেন তিনি বলেছেন- "কারণ নফ‡সi এতে কোন অংশ নেই।" যখন আমি কিছু করি এবং এটি খুব কঠিন এবং কেউ দেখে না, ধন্যবাদ বা পুরস্কার কোন কিছুই নেই|

আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দেব যা আপনারা সবাই অনুভব করবেন এবং এটি একটি আধুনিক উদাহরণ। যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট করেন, প্রথম যে জিনিসটি আপনি দেখতে চান, তা হলো, কি? আপনি কি চান? লাইক। এবং আপনি খুব খুশি হন, "ওয়াও, ১০ মিনিটে এক হাজার লাইক!" কি এটা? কি? এটা আমাকে খুব খুশি করে। আর যদি শূন্য লাইক আসে, আপনি কি বিরক্ত হবেন? হ্যাঁ, কারণ আমার নফস এর কোনো অংশ নেই এতে।

আমরা যখন কিছু করি, তা যদি আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে আমাদের হৃদয়ে কখনও কোনো ঘৃণা, রাগ বা বিরক্তি থাকবেনা। এর জন্য তিনটি গুণ থাকতে হবে| তিনটি মূল বিষয় থাকলে মানুষের হৃদয়ে কোনো বিদ্বেষ বা রাগ থাকবে না| প্রথমত, আপনি যা করছেন তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে| দ্বিতীয়ত, অন্যদের উপদেশ দেওয়া, বিশেষ করে নেতাদের| তৃতীয়ত, আমাদের ভাষা এবং আচরণে সততা বজায় রাখা। যখন আপনি কাউকে প্রশংসা করেন, তখন অবশ্যই এটাও মনে রাখবেন যে আপনি কোনো খারাপ গুণ তুলে ধরছেন না, কারণ আল্লাহই পরিপূর্ণ।

আলহামদুলিল্লাহ, আপনি যদি সততার মাধ্যমে কিছু করেন, তা সঠিকভাবে আল্লাহর জন্য হবে। আপনি যখন কাউকে নিমন্ত্রণ করবেন, আপনার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া উচিত, তাদের হাসি-খুশি বা সামাজিক সম্পর্কের জন্য নয়, তবে এটা অবশ্যই একটি উপকারিতা হতে পারে। আপনি যদি নিজের ঘর বা বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেন, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষে সহায়ক হতে হবে। আমাদের সকল কাজের মধ্যে সততা থাকা উচিত, যেন আমাদের প্রতি আল্লাহর তুষ্টি আসে।

এভাবেই প্রতিটি পদক্ষেপে সততার সাথে জীবন কাটাতে হবে, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং আমরা তাঁর পথে চলতে পারি।

হযরত ওমর (র.) সবসময় সত্যের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, লোকেরা সেটি পছন্দ করুক বা না করুক, তারা তার প্রশংসা করুক বা না করুক, কারণ তারা সবাই আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন।

রসুল ﷺ বলেছিলেন– "ওমরকে জান্নাত দেওয়া হয়ে গেছে, এবং যদি আমার পরে কেউ নবী হতো, তবে সেটি ওমরই হতো।

হযরত ওমর রা. এর অন্তিম সময়ে তার ছেলে আব্দুল্লাহকে পাঠিয়েছেন আয়েশা রা. এর কাছে অনুমতি চাওয়ার জন্য এই বলে যে ওমর রা. এর দাফন যেনো রসুল ﷺ ও আবু বকর রা. এর সাথে দেয়ার জন"।কিন্তু ওমর তার ছেলে পাঠিয়েছিলেন, এবং তিনি খলিফা ছিলেন, তিনি সহজেই আদেশ দিতে পারতেন, "আমাকে তার পাশে কবর দিন।" কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "না, মৃত্যুর পরে, তুমি আবার তার কাছে যাও, যদি সে সম্মতি দেয়।" কেননা, তিনি তাকে খলিফা হওয়ার কারণে ভয় পেতেন এবং তিনি চাইতেন, যদি এটি তার জন্য গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে সেটি আল্লাহর জন্য উপযুক্ত হবে না। তারা গিয়েছিল এবং তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। তাই উমর এবং আবু বকর (র) আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, তাদের জীবন ছিল আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাথে, আল্লাহর দ্বারা। আল্লাহ সাথেই রয়েছেন, কেবল মক্কা ও মদিনা নয়।

এটি আসল ধর্ম। ইসলামি ধর্মের জন্য, সঠিক পথে চলার জন্য, সৎ ইচ্ছা ও কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা একে অপরকে সম্মান দিতে চাই, আল্লাহর প্রশংসা না করে, আসলেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছি না। আমরা সবাই আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চাই, কিন্তু আমরা কজন এই সম্পর্ক নিয়ে কাজ করি?

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۝ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন।

সুরা যুমার এর প্রথম আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে, সবসময় যা বলা হয় তা হলো—আল্লাহকে আন্তরিকতার সাথে উপাসনা করতে। যদি আমরা সবাই সেই অবস্থানে পৌঁছাতে পারি, এবং এটি সম্ভব—এটা অসম্ভব নয়, এটা সহজ নয়, এটা একটি উত্থান-পতনপূর্ণ পথ, অনেক ব্যর্থতার সঙ্গে, তবে আমরা এটি করতে পারি। আপনি যখন সেই আন্তরিক ব্যক্তি হয়ে উঠবেন, আল্লাহ যেটি চান, আপনি তখন সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হয়ে উঠবেন, আমি সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হয়ে উঠব। আপনি জানেন কেন? কারণ এতে কোনও ব্যাপার নয়, যদি আমি বর্তমান ভাষায় বলি, আমি আমার চিন্তা বা অনুভূতি

নিয়ে কিছুই পরোয়া করি না, যেমনটা আমরা বলি, আপনি যদি এটা আন্তরিকভাবে বলতে পারেন, মানুষের পছন্দ অথবা অপছন্দ সম্পর্কে, মানুষ যদি নেতিবাচক কিছু বলে বা ইতিবাচক কিছু বলে, আমি কিছুই পরোয়া করি না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার কাছে কি, তা হলো—আল্লাহ আমার সম্পর্কে কি ভাবেন? আপনি সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি, আপনি সবচেয়ে পবিত্র ব্যক্তি। এবং আবার, আমি জানি না, কিন্তু আমি বলতে পারি, আপনি জান্নাতের খুব কাছে যাচ্ছেন।

আমরা যা কিছু করি তা আমরা আল্লাহর জন্য একটি ইবাদত হিসেবে পরিবর্তন করতে পারি। ইবাদত কী?

প্রতিটি মানুষের জীবন অন্য জীবনের থেকে খুব আলাদা। কেউ মা, কেউ মা এবং স্ত্রীর ভূমিকায়, কেউ মা এবং বিধবা, কেউ মা, দাদি, মেয়ে, এবং কেউ সবগুলোই। আবার, আপনি একজন মহিলা, যারা শুধু ঘরের কাজ করেন না, বাহিরে কাজও করেন। তাহলে, আমি কীভাবে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হব? এটা শিখুন এবং আল্লাহর জন্য একমাত্র এটা প্রয়োগ করুন, এবং এটি প্রতিবার আপনার মুখে এবং মস্তিষ্কে পুনরাবৃত্তি করুন। আপনি যা কিছু করেন এবং বলেন—বহিরঙ্গী, অন্তরঙ্গী—আপনার প্রতিটি কাজ এবং বলার মধ্যে যেন আল্লাহর প্রিয় এবং সন্তুষ্টি থাকে। এতে দুটো বিষয় রয়েছে, এবং আমি আপনাদের কিছু উদাহরণ দিব। আপনি যা কিছু করেন, তা আল্লাহর জন্য, আপনি যদি কাউকে কিছু বলুন এবং তারা যা বলেছে তা সত্য নয়, এবং আপনি খুব ভালোভাবে জানেন আপনি তাদের উত্তর দিতে সক্ষম, তবে আপনি নিজেকে থামিয়ে বললেন—এটা ইবাদত নয়, আমি কিছু বলব না এবং আমি করতে পারি, শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, কারণ আল্লাহ এটি পছন্দ করেন এবং এতে তিনি সন্তুষ্ট। এটা ইবাদত।

এখন, শিখুন, আপনার প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি কথা পরিবর্তন করুন, আপনার প্রবেশের ধরন, আপনার বাহ্যিক আচরণ, সবকিছু পরিবর্তন করুন। যখন আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে দেখতে পাবেন, আল্লাহ আপনাকে সেই সৎসিদ্ধতা দেবেন যা আপনি চান, এবং এটা একমাত্র জন্নাতে পৌঁছানোর মাধ্যম। এরপর, আপনার কাছে একটি হাওয়ায় থাকবে এবং সেই হাওয়া হবে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পরিষ্কার, সবচেয়ে পবিত্র এবং সবচেয়ে সুন্দর, এবং তা আপনাকে জন্নাতে পৌঁছে দেবে।

ইখলাস, যেমন আপনি পানি পান করছেন, আপনি কেন পানি পান করছেন? আমি সত্যিই বলছি, যা কিছু আপনি করছেন, তা সম্পর্কে সৎ হোন। আপনি এখনB অন্যদের শেখাবেন না, আপনি যখন এটি অভ্যাসে পরিণত করবেন, তখন আপনার মধ্যে তা প্রকাশিত হবে, এবং মানুষ তা দেখবে।

এখন দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, আমরা বলেছিলাম যে সেই লেকের কথা, যা সব নদী মিলিত হয়ে শেষ হয়। যদি আমি এটি প্রয়োগ করি, তাহলে যে সব নদী আসবে, সবই সেই লেকে মিলিত হবে, এবং সেই লেক হবে পবিত্র এবং সুন্দর। যখনই আপনি পানি, লেক , নদী, সমুদ্র, বা সাগর দেখবেন, নিজেকে প্রশ্ন করুন, "এটি কি আমার হৃদয়?"

এখন কিছু বিষয়, কেন হৃদয়? কারণ আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে শিখিয়েছেন যে, আমি যদি আল্লাহর কাছে সফল হতে চাই, তাহলে আমাকে পবিত্র, সুস্থ এবং বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আসতে হবে।

এখন আমি চাই আপনাদের এটি ভিন্নভাবে দেখাতে। আমার সাথে এটি ভাবুন: যখন আপনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে চান, যেকোন সিদ্ধান্তই হোক না কেন, আমি কোন কাজ করতে যাচ্ছি না, সবকিছুর শুরু কোথায়? কিছু একটা আপনার মধ্যে কথা বলছে, আপনার মধ্যে একটি আলোচনা চলছে। আমি এটিকে সাধারণত "সকাল বেলার আলোচনা" বলি।

এটা হলো সেই অভ্যন্তরীণ আলোচনা, যখন আপনি খুব ক্লান্ত থাকেন, তখন আপনার মধ্যে একটা শব্দ বলে, "আরও ৫ মিনিট বা ১০ মিনিট ঘুমিয়ে থাকো।" কিন্তু অন্য এক ভয়েস বলে, "এটা ফজর, উঠো| প্রতিদিন এমন একটি আলোচনা চলে। এবং এটি সব কিছুতেই প্রযোজ্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এই আলোচনা কে করছে? যদি অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়, তাহলে আপনার হৃদয় পবিত্র। যখন আমি বলি সঠিক, আমি মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বলতে চাইছি না, আমি বলছি, আল্লাহর দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক।

এখন হৃদয় সম্পর্কে চিন্তা করুন। যদি আপনি কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা ফোন দেখেন, আজকাল সব কিছু ফোন বা আইপ্যাডে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কী? এটা কি স্ক্রীন, নাকি অন্য কিছু? এটি স্ক্রীন না, এটা হলো হার্ড ড্রাইভ। স্ক্রীনটা বাইরে দেখা যায়, কিন্তু কি নিয়ন্ত্রণ করছে সেই স্ক্রীন? আপনার হার্ড ড্রাইভ। যদি হার্ড ড্রাইভ মারা যায়, তাহলে পুরো কম্পিউটার কাজ করবে না।

আমরা যদি এটি মানব শরীরের সাথে তুলনা করি, তাহলে আপনার হৃদয় হলো সেই হার্ড ড্রাইভ। যদি আপনার হৃদয় পবিত্র হয়, তবে আপনি যা কিছু বলবেন এবং দেখবেন, তা পবিত্র হবে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে।আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও শুদ্ধতা নিয়ে, আমার হাতগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চলবে, কারণ আদেশগুলো সরাসরি হৃদয় থেকে আসে—একটি শুদ্ধ হৃদয় থেকে। এটি অন্য কোন কণ্ঠের থেকে আসে না। সেই কথোপকথন মনে রাখুন, সাধারণত এটি আমার নফস এবং আমার হৃদয়ের মধ্যে হয়। নফস মূলত যা উপভোগ করতে চায় এবং যা আল্লাহর কাছে পছন্দসই নয়, সেটি

অনুসরণ করে| এটি আমার পছন্দ অনুসারে চলে, যেমন আমি যা চাই, আমি সেখানে মানিয়ে নিতে চাই। এটাই হলো নফস। হৃদয় হল শুদ্ধ হৃদয়। তাই, সেই কথোপকথনে কে জয়ী হয়, তা পরবর্তীতে পর্দায় (যা আমি প্রদর্শন করি) ফুটে ওঠে। যদি আমি হৃদয়কে শুদ্ধ করি, তাহলে সব কিছুই শুদ্ধ হবে, আল্লাহর কাছে পছন্দসই হবে।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কীভাবে আমি সেই বিশাল লেকে পৌঁছাবো? যদি আমি হৃদয়কে প্রতিদিন $\frac{24}{7}$ শুদ্ধভাবে পালন করি, তবে আমার হৃদয় শুদ্ধ হবে এবং এর ফলে সব নদী পরিষ্কার হয়ে আসবে। তবে, যদি আমি হৃদয়কে নোংরা করি, নদীগুলোর পানি নোংরা হয়ে যাবে। যা আমার হৃদয়কে দুর্বল করে, আল্লাহর কাছে আমি দুর্বল হয়ে যাবো। আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবো, আমি যা দেখি, তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমি যখন ল্যাপটপ বা ফোন চালু করি এবং স্ক্রল করি, তখন আমি একটি সিদ্ধান্ত নিতেই পারি—আমি কী দেখতে চাই? যদি আমি কিছু নোংরা বা হারাম বিষয় দেখি, আমি কী তা বন্ধ করবো না? এটি আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমি এটি দেখি বা না দেখি, এটিই আমার নিয়ন্ত্রণ।

আমরা সাধারণত যখন বিছানায় থাকি, ফোন দেখি, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে কিনা, সেটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিয়মিত অভ্যাসগুলো শুদ্ধ হওয়া উচিত, কারণ যা কিছু আমরা দেখি বা শুনি তা আমাদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। আল্লাহ আমাদের কানের মাধ্যমে শুনতে দিয়েছেন, চোখ দিয়ে দেখতে দিয়েছেন, তবে আমরা তা কিভাবে ব্যবহার করছি?

সূরা ইসরার ৩৬ নং আয়াতে আছে–

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।

এই পৃথিবীতে আমরা যেসব খাদ্য গ্রহণ করি, তা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমাদের আত্মিক স্বাস্থ্যেও কী কী দিক শুদ্ধ রাখছি, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কখনো কখনো, যা কিছু 'হালাল' তা অতিরিক্ত হতে পারে এবং তা আমাদের হৃদয়ের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

হৃদয়ের পরিশুদ্ধির মূলনীতিÑ আপনি যদি শক্তিশালী হৃদয় চান, আত্মা শক্তিশালী থাকলে নাফস অটমেটিক দূর্বল হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাকে সহজ করে বুঝতে সাহায্য করুন| যাতে আপনি এখান থেকে এর মূলনীতি বুঝে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন। তাহলে, যদি আমার (নাফস) চায় এবং প্রতি সময় তাকে আমি সেটি দিই, তাহলে হৃদয় ছোট হয়ে যাবে এবং শক্তি হারাবে, যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমাবে। যখন হৃদয় দুর্বল হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর স্মরণ করা কঠিন হয়ে যাবে, অবাধ্যতা থেকে বিরত

থাকা কঠিন হয়ে যাবে, কারণ এটি নিয়ন্ত্রণ করছে অন্যদিকে, অন্যটি নিয়ন্ত্রণ করছে। নিজের দিকে তাকান এবং রমজান মনে করুন, আপনি আপনার (নাফস) কে যে কাজগুলো করতে চাইছিলো, সেগুলো থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি রোজা রাখছি, তাই ১০ টায় কফি খাওয়া হয়নি, ৪টা পিএম-এ চা টাইম হয়নি। আবার, কিছুই হারাম নয়, তবে অতিরিক্ত হালাল (শরীআত সম্মত) হারাম হয়ে যেতে পারে। তাযকিয়ার আলেমরা শেখান, *"অতিরিক্ত হালাল হৃদয়কে নষ্ট করে," কারণ* নফস *অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়।* তাহলে যখন আমি বলি, "আমি এটি চাই, আমি এটি ভালোবাসি," এটি আমার নফস কথা বলছে| এটি আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার চিন্তা নয়। যদি আমি আমার হৃদয়কে শক্তিশালী করতে চাই, তাহলে এর জন্য আমাকে সৎ এবং বিশুদ্ধ হতে হবে। রমজান মাস যেমন আমাকে শিখিয়েছে, যদি আমরা কম খাই, কম ঘুমাই, কম কথা বলি, এবং আল্লাহর স্মরণ বৃদ্ধি করি, তাহলে নফস অনেক দুর্বল হয়ে যাবে, এবং হৃদয় অনেক শক্তিশালী হবে।

এটি যদি আপনি রমজানে প্রয়োগ করেন, আপনি দেখবেন এটা কতটা সত্য। এর পরে, আমি বলব, "রোজা ছাড়ার পর, ঈদের দিনে, কেন আমরা সবকিছু বেশি করি?" বেশি খাওয়া, বেশি ঘুমানো, বেশি কথা বলা — একে একে সবকিছুতে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা। তবে এটি প্রাকৃতিক ফলাফল। দিনে ২৪ ঘণ্টা আছে, ৪৮ ঘণ্টা তো নয়। তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি আমার, আপনার, আমাদের পছন্দ — আমি কি করছি এবং কি দিচ্ছি।রামাদান শেষ, ঈদ এসেছে, প্রতিটি কম কিছু বেশি হয়ে গেছে, সত্য না মিথ্যা? আমি বেশি খাই, বেশি কথা বলি, বেশি ঘুমাই, আমি খুব ক্লান্ত, আলহামদুলিল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই, আমি যেয়ে ঘুমাতে যাবো, আর দিনের বেলায় বিশ্রাম নিবো, আমি আরাম করতে যাবো, অথবা বাইরে যাবো, কফি শপে যাবো। যখন এগুলো বেশি হয়, তখন স্বাভাবিক ফলাফল হলো কম হবে। দিনে মাত্র ২৪ ঘণ্টা থাকে, রামাদানের পর ৪৮ ঘণ্টা করতে পারি না, তাই না? তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটা আমার পছন্দ, আপনার পছন্দ, আমাদের পছন্দ।

মনে রেখো, নদীগুলোর কথা, প্রতিটি হারাম আমি যেটি দেখি, আমার নাফস শক্তিশালী হয়, হৃদয় দুর্বল হয়ে যায়। প্রতি হারাম আমি যেটি শুনি, এমনকি যদি আমি সেটা বলি, আমার হৃদয় দুর্বল হয়। প্রতিটি দিন যখন আল্লাহর স্মরণ ছাড়া যায়, আমি বলি, "হায়, এই দুঃখী হৃদয়, তুমি আজ আরও দুর্বল হয়ে গেছো। তাই, আমার ফোকাস, একজন মুসলিম নারী বা মুসলমান হিসেবে, যিনি আল্লাহর পথে মনোযোগী, যিনি জান্নাতে যেতে চান।

আপনাদের সকলেরই আলাদা আলাদা পথ রয়েছে, কিন্তু একই পথে আমরা সবাই আছি, শুধু আমাদের স্টেশন ভিন্ন। কখনো কখনো আমি একটু পিছনে থাকি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমি এখনও পথেই আছি। আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে ১৭ বার আল্লাহর কাছে দোয়া করি, কেন? যদি এটি সহজ হতো, তিনি আমাকে বলতেন না তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে।

তবে, দয়া করে মনে রাখবেন, যখন অনেক কিছু বেশি হয়, তখন এটি দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য আপনি দেখতে পান যে মানুষ বর্তমানে উদ্বেগ এবং বিষণ্নতায় পড়ছে, কারণ এটি কোনো ধর্মীয় দুর্বলতা নয়, বরং আমার নাফস খুব বেশি পছন্দের মধ্যে পড়ে, এবং আমি তাকে আরও (নষ্ট) করে ফেলছি।

আপনার নাফসকে প্রশিক্ষণ দিন যাতে এটি আপনার দাস হয়ে থাকে। আপনার নাফসকে আপনার দাস বানান। আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে, আমি কি বলবো? আজ সকালে কফি হবে না, আমি এটাকে ভালোবাসি, আমি দুঃখিত, তুমি যা চাও তা সব পাবে না। আমরা কি এই কথাগুলো আমাদের সন্তানদের বলি না? এটা ঠিক একই ধারণা।

আলেমরা বলেন, "আমার নাফসই শিশু; যদি তাকে সবকিছু দেওয়ার অনুমতি দিই, সে চিরকালই চাহিদা পাবে।" কিন্তু যদি তাকে প্রশিক্ষণ দিই, সে এখনো থামতে পারবে। আজকের দিনে, সব কিছু সহজলভ্য—এটা এক ধরনের সমস্যা।

"যখন আপনি ১০ বা ১৫ বছর ধরে এমনভাবে বাঁচেন, যেখানে সব কিছু আপনার ইচ্ছা মতো পাওয়া যায় না, তখন আপনি জীবনযুদ্ধেi জন্য প্রস্তুত।"

আমাদের নাফসকে, আমি বলব না আত্মিকভাবে মেরে ফেলতে হবে, তবে আমি বলব প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আরবিতে একটি প্রসিদ্ধ কথা আছেÑ *আমরা একটি জাতি, যারা খেতে যাবে না যদি না তারা ক্ষুধার্ত হয় এবং যখন আমরা খাব, তখন কখনো পূর্ণরূপে খাব না, এমনকি আর কিছু খাওয়ার প্রয়োজনবোধ করব না।*

আমাদের কেনা-বেচা করতে যাওয়ার সময়ও, প্রথম প্রশ্ন হতে হবে, "আপনার এর প্রয়োজন আছে?" উত্তর প্রায়শই "না" হবে। কিন্তু আমরা এটি পছন্দ করি, তাই আমাদের নাফস খাচ্ছে, এটি বিক্রির জন্য রাখা। এটি আমাদের আকর্ষণ করে, এবং আমরা তা কিনে ফেলি।

এভাবে নাফসকে প্রশিক্ষণ দিন, এটি আপনার দাস হতে হবে, আপনি না! আমাদের জন্য জীবনযাত্রা কঠিন হতে পারে, কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণ দিলে এটি সহজ হবে। যখন আপনি বাজারে যান, মনে রাখুন, যদি আপনার কিছু প্রয়োজন না থাকে তবে কিনবেন না। এটি কেবল একটি সাধারণ দৃষ্টিকোণ ছিল যা নাফসের প্রশিক্ষণের জন্য দরকার।

এখানে তিনটি জিনিস ছিল

প্রথমত, আল্লাহর জন্য কাজ করতে শিখো, মানুষের দিকে তাকিয়ে কাজ করোনা, নিজের দিকে তাকানো তো দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, "পিউর হার্ট" নামক একটি ধারণা শিখো, যা তোমাকে সোজা জান্নাতে পৌঁছে দেবে। তৃতীয়ত, হলো তোমার হৃদয়ের অবস্থান।

মনে রেখো, তিন ধরনের হৃদয় আছে। হৃদয়ের অনেক ধরনের সংজ্ঞা আছে, কিন্তু আমরা কুরআন থেকে সহজভাবে ধারণা নেব। প্রথমটি হলো সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হৃদয়, যা সরাসরি জান্নাতে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি হলো মৃত হৃদয় এবং তৃতীয়টি হলো অসুস্থ হৃদয়।

এছাড়া, আমি নিজেই একদিনে এই তিনটি অবস্থায় থাকতে পারি, যেমন সকালে আমি মানসিকভাবে মৃত, দুপুরে আমি পুরোপুরি শুদ্ধ, এবং সন্ধ্যায় আমি আবার অসুস্থ হয়ে যেতে পারি। এভাবে দ্রুত পরিবর্তন কিভাবে ঘটে? কি পরিবর্তন করে আমাকে? আমি তো একই ব্যক্তি, একই শহর, একই কাজ, কিছুই বদলায়নি। তাহলে, কি পরিবর্তন ঘটাবে? তুমি কি খাও, তুমি কি শুনছো, তুমি কি দেখছো, তুমি কোন জিনিস শিখছো, বা তোমার কি প্রভাব পড়ছে, এগুলোই তোমাকে পরিবর্তন করে।

এখন মৃত হৃদয় নিয়ে আলোচনা করি। মৃত হৃদয় কি? আল্লাহ বলেন, কুরআনে এবং সুন্নাতে যারা বিশ্বাসী নয়, তাদের হৃদয় মৃত। যখন আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেন, অর্থাৎ যখন তারা কুরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করে, তখন তাদের হৃদয় জীবিত হয়ে ওঠে। রমজানে তুমি নিজেকে দেখো, তোমার মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, তাহলে তোমার হৃদয় জীবিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ বলেছেন, আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে পার্থক। যেই ব্যক্তি অন্ধকারে থাকে, সে তো কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি আলোতে থাকে, সে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। আল্লাহর পথ অনুসরণকারী এবং না-মানা ব্যক্তি কখনোই এক হতে পারে না।

যখন তুমি সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারো না, এবং আল্লাহর আইন অনুযায়ী কোনো কিছু সঠিক না হলেও তুমি সেটিকে করো বা সহজভাবে গ্রহণ করো, তখন তোমার হৃদয় মৃত। যদি তুমি ভুল কিছু করো এবং এর জন্য তোমার কোনো অনুশোচনা না থাকে, তবে তুমিও মৃত হৃদয়ের অধিকারী। যখন তুমি কোনো ভুল করো, এবং পরে সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হও, তখন তোমার হৃদয় অসুস্থ হয়ে গেছে কিন্তু মৃত হয়নি। এমনকি যদি তুমি কাজের জন্য দুঃখিত হও, এবং আল্লাহর কাছে দুঃখপ্রকাশ করো, তাও তোমার হৃদয় ঠিক হয়ে উঠতে পারে।

যে আলো আপনার আছে, তা আপনার হৃদয় দেখছে এবং অনুসরণ করছে, তারা এক নয়। মৃত হৃদয় হলো অনুসরণ করা, খুব সোজা। আবার, আপনি আল্লাহর আদর্শ অনুযায়ী

সঠিক ও ভুলকে পার্থক্য করতে পারবেন না, আপনি তা সঠিক বলে মনে করবেন, আপনি তা গ্রহণ করবেন, আপনি বা আমি সেটা করব, আমরা কোনো অনুশোচনা ছাড়া তা করব। এই শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনুশোচনা। অনুশোচনা হলো এমন একটি শব্দ যা আপনার হৃদয়কে পুরোপুরি আন্দোলিত করে। আপনি ফজর নামাজের জন্য উঠলেন না, কারণ আপনি ক্লান্ত ছিলেন—এটাই গল্পের শেষ, মৃত। আমি ফজর নামাজের জন্য উঠলাম না, এবং আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকি, কখন এটা শেষ হবে? কখন আমি পরিবর্তিত হব? আপনার হৃদয় অসুস্থ, তবে মৃত নয়। আমি ফজর নামাজের জন্য উঠলাম না, কিন্তু আজ আমি গতকালের চেয়ে অনেক বেশি ভালো কাজ করব। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব, আমি কাঁদব, আমি হতাশ, আমার হৃদয় এমনভাবে অবস্থা বিরতি নিবে।

যে কোনো সময় আপনি আল্লাহর আনুগত্যের অবস্থায় থাকবেন, আপনার হৃদয় মৃত নয়। মৃত হৃদয় হলো যখন আমি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি করি, কোনো ভিন্ন মতামত নেই, এটা স্পষ্টভাবে হারাম এবং আমি এটি দেখছি বা শুনছি বা বলছি এবং উপভোগ করছি, তখন আমার হৃদয় মৃত। এবং এজন্য বলা হয়েছে যে সত্যিকার মুমিন কেউ যিনা বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক করে তখন তার হৃদয় মৃত থাকে।

এখন আসুন, সঠিক হৃদয় সম্পর্কে বলি, সম্পূর্ণ বিপরীত। সঠিক হৃদয়ে দুটি জিনিস আছে, দুটি শক্তি, যেগুলি আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় চালিত করে—একটি হলো ইচ্ছা এবং অন্যটি হলো চিন্তা। এই দুটি একসাথে চলে। যদি আপনি সঠিক হৃদয়ের কথা বলেন, তাহলে প্রতিটি চিন্তা আল্লাহ যা বলেছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা ২০২৫ সালে আছি, এখন আমি ভাবছি, তারা সাহাবীরা এমন ছিল, কিন্তু আমি তা নই, সেটি মদিনা বা মক্কা ছিল, কিন্তু আমি হাদিসের ব্যাপারে সন্দিহান, কেন আমি হাদিস মেনে চলব? এই সমস্ত চিন্তা সঠিক হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সঠিক হৃদয়ে আল্লাহ বললেন, "আমি শুনব এবং আমি মেনে নেব"। যখন আল্লাহ বলেছেন গীবত করা হারাম, তখন আমরা কি বলি, "আপনার কি মরে যাওয়া ভাই বা বোনের মাংস খেতে ইচ্ছে করে?" এটা কুরআন, এটি স্পষ্ট। এই আয়াতের একাধিক অর্থ হতে পারে না। কেন আমি গীবত করি? মনে করুন, আমার মনে আসছে, এটি সত্য, সে এমন বা সে ওমন তবে যখন আমি এটা বলি, আমি আমার চিন্তা করছি। আল্লাহ বলেছেন, *"যদি এটি সত্য হয়, তাহলে এটি গীবত।" আর যদি এটা মিথ্যা হয়, তবে এটি চোগলখোরি।*

আমি যখন গীবত করি, তখন আমি ভালো অনুভব করি, আমি আমার রাগ বের করে দিচ্ছি, সে আমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছে, আমি তার সম্পর্কে বলব, সে মনে করে সে ভালো, চল দেখি আমি কী করতে পারি। এটি হলো আমার নফস। যখন চিন্তা আল্লাহ

যা বলেছেন তা অনুসরণ করে, আমি বলব, "আমি জানি এটা উচিত নয়, আমি দুর্বল, আমি সত্যিই চেষ্টা করছি, আল্লাহ সাহায্য করুন," এটি খুব ভালো খবর, আপনি পরিবর্তিত হবেন, কারণ আপনি জানেন আপনি ভুল করছেন। এভাবেই আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহায়তা করুন, আমীন।

সুতরাং, একজন বিশুদ্ধ হৃদয়ের মানুষের ভিতরের প্রতিটি চিন্তা এমন, যা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

এখন আসুন দ্বিতীয় বিষয়ে—"চাহিদা", যা সবচেয়ে বড় একটি বিষয়। আমার প্রতিটি চাহিদা—হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে এমন চাহিদা দিন—আমার প্রতিটি চাহিদা যেন তাঁর কথা বা কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

ইমাম ইবনে আল-কাইয়্যিমের কথা—তিনি এমনভাবে বলেছেনÑ

"হে আল্লাহ, আমাকে এটা দিন, আমি একা এটা করতে পারি না।"

তিনি বলেন, সেই হৃদয়ই "সালিম" বা বিশুদ্ধ ও নিরাপদ হৃদয়,

যা নিরাপদ শোনো প্রতিটি চিন্তা থেকে, যা আল্লাহর আদেশ-বিধানবিরোধী,

এবং প্রতিটি চাহিদা থেকে, যা তাঁর আদেশ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে।

ফলাফল কী?

প্রতিটি অনুভূতি—ভালোবাসা, ভয়, ভরসা, চিন্তা, কর্মের গতি—সবই আল্লাহর জন্য|

তুমি তোমার হৃদয়ের কথা ভাবো—তোমার হৃদয়ের প্রতিটি অনুভূতি,

ভালোবাসা হোক বা ভয়, নির্ভরতা হোক বা আকর্ষণ—সব যদি আল্লাহর জন্য হয়, তবে তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ।

তুমি তোমার সন্তানদের ভালোবাসো—তাতে তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ নয়, এমনটা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—তুমি কেন ভালোবাসো? সেই ভালোবাসা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? সেই অনুভূতি তোমাকে কী করাচ্ছে?

একজন ব্যক্তি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর মা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বললেন, তুমি পাগল হয়ে গেছ! যদি তুমি এই পথ থেকে না ফেরো, আমি না খেয়ে মরব।" এখন ভাবো—এটা যদি তুমি বা আমি হতাম!

মা বললেন, আমি না খেয়ে মরবো, যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ না করো।"

তিনি জবাব দিলেন:

"যদি তুমি সাতবার মরো, আর প্রতিবার আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করেন, তবুও আমি আমার দ্বীন ছাড়ব না।"

অবশেষে মা খাওয়া শুরু করলেন। এটাই হলো সঠিক “আনুগত্য”। তিনি তাঁর মাকে ভালোবাসতেন, কিন্তু আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রথম।

রাসূল (সা.) তাঁর মেয়ে ফাতিমা সম্পর্কে বলেন:

“ফাতিমা, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তোমাকে কিছু রক্ষা করতে পারবো না।”

কুরআনে বলা হয়েছে:

সেদিন মানুষ পালাবে—তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবার কাছ থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। (সূরা আবাসা 80:34-36)

যাদের জন্য আমরা আল্লাহর অবাধ্য হই, তাদেরই থেকে সেদিন আমরা পালাব।

প্রশ্ন হলো: কেন আমি আজ থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করি না যে, আল্লাহর চেয়ে কেউ অগ্রাধিকার পাবে না? কারণ? প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আমি আমার নফসকে খাওয়াই। আমি আমার নফসকে সব কিছু দিই যা সে চায়।

আমি আল্লাহকে প্রাধান্য দিই না। আমার চাওয়া, আমার পছন্দ, এগুলোই আমার অগ্রাধিকার।

আজকাল একটি কথা খুব প্রচলিত: “আমি চাই সবার মত হতে।”

কিন্তু , কেন সবাই আমার মতো হতে চাইবে না?

নিজেকে বলো: “তুমি কেন সেই আদর্শ হবে না, যাকে দেখে সবাই বদলাতে চায়? কেন আমি বদলাই না মানুষকে? কেন আমি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চাই?

কেন আমি মানুষকে ভয় পাই, অথচ আল্লাহকে না? আমি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাই, কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা আমার অগ্রাধিকার নয়।

তুমি বা আমি নয়, জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একমাত্র আল্লাহকে খুশি করা। যদি তুমি এটা শিখে ফেলো, তাহলে জেনে রেখো এটা একটা প্রক্রিয়া| আমরা অবশ্যই ব্যর্থ হবো, এখনও হচ্ছি, কিন্তু আমরা আবার উঠে দাঁড়াই। যখন তুমি আল্লাহকে তোমার জীবনে প্রথম স্থানে রাখবে, তখন বাকি সব কিছু তোমার ইচ্ছেমতো চলবে।

সবাই এই হাদীস জানো, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো —

নিশ্চয়ই শরীরে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যদি তা ঠিক থাকে তবে পুরো শরীর ঠিক থাকে, আর যদি তা খারাপ হয় তবে পুরো শরীর খারাপ হয়।

আর সেই মাংসপিণ্ডটি হলো হৃদয়।

তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করো, কেন আমি ফজরের জন্য উঠতে পারি না? নিজেকে জিজ্ঞেস করো, আমার হৃদয়ে কী সমস্যা যে সে আমার নফসকে হারাতে পারে না, যে ঘুমাতে চায়?

তুমি হারাম কিছু দেখলে কেন চোখ বন্ধ করতে পারো না| "কেন পারছি না", বরং বলো, আমার হৃদয় কেন এত পবিত্র নয় যে সে আমার চোখকে হুকুম দিতে পারে | দৃষ্টি নত করো, বন্ধ করো, তাকিয়ো না, কথা বলো না।"

কারণ আমরা প্রতিদিন সকালে ও রাতে আমাদের নফসকে খাইয়ে দিচ্ছি।

আল হাসান আল বসরী (রহ.) এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন–

"তোমার হৃদয়কে চিকিৎসা দাও।"

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান, তা হলো পবিত্র হৃদয়।

আমরা সবাই আমাদের বাহ্যিক রূপ নিয়ে চিন্তিত — নারী হিসেবে সুন্দর হতে চাই, কিছুই ভুল না। সবাই চায় ভালো লাগুক, সুন্দর দেখাক। কিন্তু হৃদয় নিয়ে আমাদের কতটা চিন্তা?

আল্লাহ তোমাদের দেহ এবং আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের হৃদয়ের দিকে তাকান। (সহীহ মুসলিম)

আমরা বাহ্যিক রূপ নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করি — চেহারা, চোখ, ওজন — কিন্তু হৃদয় নিয়ে কত সময় ব্যয় করি?

আল্লাহ তোমার চেহারার রঙ, উচ্চতা, হাড়ের গঠন দেখবেন না — কারণ এসবের নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে নেই। কিন্তু হৃদয় — ওটা পুরোপুরি তোমার নিয়ন্ত্রণে। তুমি কি খাওয়াচ্ছো, তুমি কী দূর করছো, তুমি কীভাবে পরিষ্কার করছো, কী রাখছো, কী খাইয়ে দিচ্ছো নফসকে — এসব তোমার নিজের হাতেই।

তাহলে এখন তোমরা ঠিক করো —

তুমি কে? তুমি কী হতে চাও? তুমি কোথায় যাচ্ছো? তোমার শেষ কোথায় হবে?

কারণ এই জীবন একবার চলে গেলে — তুমি, আমি, আমরা সবাই — মাটির নিচে যাবো।

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।"

আল্লাহ কুরআনে তিনবার এটা বলেছেন।

এক আয়াতে বলেছেন,

"আর আমরা তোমাদের পরীক্ষা করবো মন্দ জিনিস দিয়ে (যা তোমরা অপছন্দ করো) ও ভালো জিনিস দিয়ে — আর তোমরা আমাদের দিকেই ফিরে আসবে।" (সূরা আম্বিয়া)

আর বলা হয়েছে —

"যে কেউ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে-ই প্রকৃত সফল।"

এই জীবন ধোঁকার জীবন — শয়তানের ধোঁকা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এমন বান্দা বানান, যারা উপদেশ শুনে তার উত্তমটি অনুসরণ করে। আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করুন। আল্লাহ আমাদের পবিত্র হৃদয় দ্রুত দান করুন।

আমাদের সিরাতে মুস্তাকীমে রাখুন। আমিন।

হৃদয়ে আল্লাহর অবস্থান

হে আমার রব তুমি কোথায় ? তুমি কি আমার হৃদয়ে আছো ? আমি এই প্রশ্নটা উল্টো করে আপনাদেরকেই জিজ্ঞেস করব। আল্লাহ কি আপনার হৃদয়ে আছেন? আচ্ছা ৫০% ধরলাম — তাহলে আল্লাহ আপনার হৃদয়ে কোথায়?

✓ শুধু প্রয়োজনের সময়?

✓ অবসর সময়?

✓ খুশির সময়?

✓ দুঃখের সময়?

✓ নাকি সব সময়?

আমরা বলবো সবসময়। অবশ্যই বলতে হবে। আমরা আমাদের নিজেকে এমনটাই ভাবি। আচ্ছা, সত্যিই যদি সব সময় হয়| তাহলে কতজন বলতে পারবে হ্যাঁ , সব সময় আল্লাহ আমার হৃদয়ে আছেন|

ধরুন, আপনি কোনো বিয়েতে দাওয়াত পেয়েছেন| আপনি আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করছেন যাওয়ার জন্য। সেই সময় আপনি নিজেকে কি প্রশ্ন করেন? হে আল্লাহ তুমি কি আমার ওপর সন্তুষ্ট নাকি আমি যখন প্রবেশ করব , সবাই কী বলবে আমাকে দেখে?

আযান হয় আপনি কি চুপ করে যান? আপনি কি সবকিছু বন্ধ করে দেন?

নাকি কেবল বলেন, চলুক, আমরা অভ্যস্ত। আল্লাহ কোথায় আমার হৃদয়ে? বুঝছেন তো? কথা বলা সহজ। দাবি করা সহজ। কিন্তু সত্যিকারের বিষয় হলো, আমাকে সত্য দেখাও। ঈমান হৃদয়ে থাকে| কিন্তু তা প্রমাণ করে আমল। কাজ সেটা সত্য বলে বা মিথ্যা বলে। আমরা সবাই আল্লাহর ওপর ঈমান রাখি, আলহামদুলিল্লাহ। এর প্রমাণ? আপনি নামাজ পড়েন, আলহামদুলিল্লাহ। যখন আপনি গুনাহ করেন, তখন আপনার মন খারাপ হয়। আপনার মনে হয় , আমি কেন এটা করলাম| কারণ আপনার হৃদয়ে ঈমান আছে।

এখন ধরুন, কেউ একটি সুসংবাদ নিয়ে এল। প্রতিটি মানুষ কোনো সুখবরের অপেক্ষায় থাকে। আমরা সবাই গাজার জন্য আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায়। ধরুন কেউ এসে বলল: আলহামদুলিল্লাহ! সেই বিজয় এসেছে! আপনার উত্তর কী হবে? আলহামদুলিল্লাহ| হ্যাঁ? তবে যে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে 'সিজদা-এ-শুকর' দেবে, সেই আসলে বলে দিতে পারবে, আল্লাহ আমার হৃদয়ে আছেন। এই জিনিসগুলো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মানুষের স্বভাবজাত।

একটি সুন্দর কথা বলা হয়: জিহ্বা হলো হৃদয়ের চামচ। এর মানে কী?

যদি হৃদয় হয় একটি পাত্র এবং তাতে কিছু খাবার থাকে, তাহলে কীভাবে জানবেন কী আছে এতে? আপনি একটা চামচ নিয়ে তা মুখে দেবেন, তাই না?

আপনার মুখে যা যাবে, সেটাই পাত্রে আছে। তেমনি, জিহ্বা প্রকাশ করে হৃদয়ের কথা। যে জিনিস নিয়ে আপনি বেশি চিন্তা করেন, সেটা আপনার জিহ্বায় আসে।

যদি আল্লাহ আপনার জীবনে এক নম্বরে থাকেন, তাহলে আপনার মুখে প্রথম কথা হবে আলহামদুলিল্লাহ| আর হৃদয়ের অবস্থা হবে — সিজদা-এ-শুকর।

আচ্ছা, এখন কুরআনের আয়াত আনছি — সূরা তাওবার একটি আয়াত।

এই আয়াতটি কেবল মুখস্থ রাখার জন্য নয় — বরং জীবনের অংশ হওয়া দরকার।

এই আয়াত সাহাবাদের জন্য নাজিল হয়েছিল।

আয়াতটি বলছে:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“বল, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোন, স্ত্রী-স্বামী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, সেই ব্যবসা যাতে ক্ষতির আশঙ্কা করো, এবং বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো — এগুলো যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের বেশি প্রিয় হয় — তবে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর হুকুম নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ ফাসিক জাতিকে হিদায়েত দেন না।” (সূরা তাওবা: আয়াত ২৪)

তিনি বলেননি যে এসব কিছু কোরো না। বরং একটা শর্ত দিয়েছেন, যাকে আরবিতে বলে মুফাদালাহ অর্থাৎ প্রাধান্য দেওয়া। তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ – এই তিনটি যদি তোমাদের কাছে প্রিয় না হয়' – এই কথাটিই বলেছেন। সুতরাং, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কোথায়? আমরা বলি, আমাকে আমার মায়ের সাথে কথা বলতে দাও, আমাকে আমার সন্তানদের খাওয়াতে দাও, আমাকে এটা সেটা করতে দাও, তারপর আমি নামাজ পড়ব। আচ্ছা, তুমি বলো জরুরি কাজ আছে, তাই এখন নামাজ পড়া যাবে না। তাহলে এটা বোঝায় যে তোমার কাছে তোমার কাজ আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে প্রিয়। আর তুমি বলো, 'আল্লাহ আমার হৃদয়ে আছেন!' কীভাবে? সেই শব্দটা أحب إليكم – 'তোমাদের কাছে বেশি প্রিয়'। আল্লাহ, তাঁর রাসূল, এবং তাঁর পথে জিহাদ – এর চেয়ে যদি অন্য কিছু বেশি প্রিয় হয়, তবে এটা সমস্যা।

আর রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ? আজকাল তো সুন্নাহ মানেই অবহেলিত কিছু। কেউ বললো মাগরিব পড়েছি তারপর উঠে যায়। কোথায় গেল তোমার জিকির আজকার, তোমার দোয়া? সাহাবীদের সময়ে এমন একজন উঠে গেলে, নবী ﷺ বলতেন, তোমার আল্লাহর

কাছে কিছু নেই চাওয়ার? তুমি বসে থেকেও আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে না। আর সুন্নাহ – যেমন ডান পা দিয়ে জুতা পরা, খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলা – এসবের কোনও বাহ্যিক কারণ নেই, শুধুই কারণ এটা সুন্নাহ। এটাই যথেষ্ট।

আর জিহাদ? আমি এখানে তলোয়ার বা যুদ্ধের কথা বলছি না। আমি বলছি 'নফসের জিহাদ' নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত করা। আজকের দিনে তুমি কতোটা নিজেকে রোধ করেছো শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য? হতে পারে সেটা হালাল কিছু, কিন্তু যদি সেটা আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেটাকেই জিহাদ বলা হচ্ছে।

তারপর কী বললেন আল্লাহ? 'فتربصوا' অপেক্ষা করো। কল্পনা করো, তোমার মা-বাবা রাগ করে বলে, একটু দাঁড়াও , কী ভয় লাগে না? এ তো স্রষ্টা বলছেন, অপেক্ষা করো।

তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াও – তুমি যদি বলো, আমি খুশি না আমার রূপ নিয়ে , তাহলে তুমি তো নিজের সৃষ্টিকেই অস্বীকার করছো। রাসূল (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন – *আল্লাহ তুমি যেমন সুন্দর করে আমার আকৃতি বানিয়েছো, তেমনই আমার চরিত্রকেও সুন্দর করো।*

তুমি বলছো, আমি সুন্দর না , কিন্তু আল্লাহ বলেছেন – *আমি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।*

তাহলে কেন তোমার এই ধারণা যে তুমি সুন্দর না? আর যারা চেহারা পাল্টায়, ওষুধ ব্যবহার করে, অস্ত্রোপচার করে – এইসব নিয়ে বিশাল বিতর্ক – হালাল না হারাম – বাদ দাও। মূল বিষয় হলো, আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তা কেন তোমার পছন্দ নয়?

আল্লাহ বলেন: এটাই আল্লাহর সৃষ্টি। দেখাও তো, যারা তাঁর বাইরে আছে, তারা কী সৃষ্টি করেছে? এটা আল্লাহর সৃষ্টি – তোমার চেহারা, আমার চেহারা – কারো হাতে নয়।

আমরা মানুষ, আমাদের মাঝে দুর্বলতা আছে। আমি কাউকে সুন্দর দেখলে হীনমন্যতায় ভুগি, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন: তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে যাও। এই আয়াতে দু'বার এসেছে: তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে যাও। আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

তাহলে প্রশ্ন, আল্লাহ কি আমার হৃদয়ে আছেন? আমার জীবনে কি আল্লাহ প্রথম স্থানে আছেন? সেই বিখ্যাত দোয়া, 'সায়্যিদুল ইসতিগফার' শুরু হয় কীভাবে?

اللهم أنت ربي – হে আল্লাহ, আপনি আমার রব। এরপর: خلقتني وأنا عبدك – আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার দাস। ‘দাস’ মানে কী? যার নিজের কোনও ইচ্ছা নেই। মালিক যেটা বলবে, সে সেটাই করবে। আমরা আল্লাহর সেই দাস, তাঁর আদেশ মানা আমাদের কর্তব্য।

আর সবচেয়ে দারুণ অংশ: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت – 'আমি আপনার সাথে করা অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর আছি যতটুকু পারি। এই ‘যতটুকু পারি’ – এটা অনেক বড় অনুগ্রহ। মানে, আল্লাহ আমাদের দুর্বলতা জানেন। তিনি বলেন, তুমি যতটা পারো, চেষ্টা করো। আগে চেষ্টা করো, তারপর বলো ‘আমি পারি না।’ এইটাই আসল কথা – আল্লাহ আমার হৃদয়ে আছেন কিনা, সেটা শুধু মুখে বললে হয় না – সেটা প্রমাণ করতে হয় আমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্তে।

এরপর আমি স্বীকার করি আমার গুনাহ। সেইদুল ইসতিগফার—এর শেষ অংশটা শুধু বলো: তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, একমাত্র তুমিই গুনাহ ক্ষমা করো।

শেষে কেন? কারণ, যদি আল্লাহ আমার ও তোমার অন্তরে থাকেন, তাহলে প্রথমেই দাসত্বের কথা স্মরণে আসে। তুমি নিজের সৌন্দর্যের দাসী না, স্বামীর দাসী না, সন্তানের, চাকরি বা অর্থের দাসী না—তুমি আল্লাহর দাসী।

আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি তোমার নিয়ামতের কথা। এটা আমি করি নাই, বরং এটা তোমার দেওয়া নিয়ামত—স্বামী, সন্তান, পরিবার, স্বাস্থ্য, চাকরি—সব কিছু। আমি তোমার দাসী, তোমার দাসের কন্যা, তোমার বান্দিi কন্যা। এমনকি আমার মা-বাবাও তোমার দাস।

যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে সিজদায় থাকে, আখিরাতকে ভয় করে, আর রবের রহমতের আশা করে তাদের কি সমান করা যাবে তাদের সাথে যারা জানে না?

আমরা কখন থেকে দাঁড়াই কিয়ামুল লাইল এর জন্য। মাত্র আধা ঘণ্টা, ফজরের আগে বা এশার পরে। একজন মুমিনের সম্মান হলো তার রাতের সালাতে।

আল্লাহ কোথায় আছো আমার অন্তরে?

তারা বলে, আমরা আল্লাহর সাথে একান্ত সময় কাটাই কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে। তুমি যদি কাউকে ভালোবাসো—তোমার স্বামী, সন্তান—তাদের একটা বার্তা কতবার পড়ো? যদি মুছে যায়, তুমি তো কেঁদে ফেলো। এটা হারাম না—এটা ভালোবাসার কথা, যার মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেই। নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আয়েশা। আর পুরুষদের মধ্যে? আয়েশার বাবা। এই ভালোবাসা—যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে—সুন্নাহ।

আল্লাহ কোথায় আছো আমার অন্তরে?

যখন তুমি কাউকে ভালোবাসো, আর সে এমন কিছু বলে বা করে যা তোমার ভালোবাসার সঙ্গে মেলে না, তুমি বলো, এই ভালোবাসা কোথায় গেল?

আর তোমার রব? যখন আযান হচ্ছে তুমি ফোনে, তারপর ঘন্টা পরে, আধা ঘণ্টা পরে, শেষ সময় ৫ মিনিট আগে গিয়ে নামাজ পড়ো।

যা দরকার:

১. সত্যি করে ভাবো—“আল্লাহ আমার অন্তরে কোথায়?

২. তিনি কি সব সময় আমার জীবনের প্রথমে থাকেন?

যখন আল্লাহ তোমার জীবনে ১ নম্বরে থাকেন, তখন এমন কিছু এলো যেটা তুমি ভালোবাসো, চাও, এবং তোমার খুব কাছেই—এটা তখনও তুমি ছেড়ে দিতে পারো। আমরা সবসময় হারাম দ্বারা পরিবেষ্টিত। হারাম সহজ, সুন্দর, এবং সবাই এটা করে। কিন্তু নিজেকে পবিত্র রাখা। আল্লাহ কোথায় আছো আমার অন্তরে?

তুমি নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করো প্রতিদিনের জীবনে। শুধু তখন না যখন তুমি মক্কায় গিয়ে কাবার সামনে দাঁড়াও। বরং যখন তুমি প্রতিদিন ব্যস্ত থাকো, যাকে আমরা বলি একটা দৌড়দি , দিন শুরু কিভাবে হয় আর শেষ কিভাবে হয়, জানি না। কিন্তু তবুও, তোমার দিন কি আল্লাহর স্মরণে জুড়ে আছে? আমাদের দীন (ধর্ম) এমন কিছু দিয়েছে যেগুলো আমরা ভুলে গেছি। আমরা বলি, এগুলো তো সুন্নাহ! তবে এগুলো শুধু সুন্নাহ নয়, এগুলো তোমাকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ কোথায় আছো আমার অন্তরে?

যখন তুমি গাড়িতে ওঠো, তুমি বলো: "সুবহানাল্লাজি সাখখারা লানা হাযা..."

তুমি কল্পনা করো, প্রতিবার গাড়িতে উঠলে যদি তুমি এটা বলো!

তুমি যখন ঘরে ঢোকো, বলো: "বিসমিল্লাহ"

বের হও, বলো: "আলাল্লাহি তাওয়াক্কালতু..."

এসব শুধু দোয়া না, এগুলো প্রমাণ করে: আল্লাহ কোথায় আছো আমার অন্তরে?

একটা বিখ্যাত উক্তি আছে:

তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করো এবং তখনও বলো তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো? এটা অসম্ভব! যদি তুমি সত্যি তাকে ভালোবাসো, তাহলে তুমি তার আদেশ মানতে বাধ্য। কারণ যে ভালোবাসে, সে প্রিয়জনের আনুগত্য করে। তোমার আনুগত্য কেবল সালাত আর রোজা নয়, বরং সবকিছুতে।

হাসান আল-বাসরি বলেছিলেন:

"আমি যখন চোখে দেখি, কানে শুনি, বা পায়ে হাঁটি, তখন ভাবি—এটা কি আল্লাহর আনুগত্যে, না অবাধ্যতা?

একটা সহজ প্রশ্ন: এটা কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, না অসন্তুষ্ট? ৯০% সময় আমরা উত্তর জানি। আমরা অজুহাত দেই: আমরা তো 2025 -এ বাস করছি সবাই এটা করছে| না, আল্লাহর সামনে এগুলো কোনো অজুহাত নয়।

তুমি আল্লাহর আনুগত্যে থাকলে এগিয়ে যাও, আর যদি সেটা পাপ হয় তাহলে থেমে যাও। এটাই মাপকাঠি: আল্লাহ কোথায় আছো আমার অন্তরে?

আমাদের সম্পর্ক আল্লাহর নেয়ামতের সঙ্গে, বিশেষ করে খাবারের। বিশেষত বুফে বা বিয়েতে, বা নিজের বাসায়—তোমার প্লেটের দিকে তাকাও। তুমি উঠে যাওয়ার পর কী খাবার অবশিষ্ট থাকে? কে সেটা খাবে?

"আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না"

তুমি জানো এটা নষ্ট হয়ে যাবে, এটা ফেলে দিতে হবে। আল্লাহ কোথায় আছো আমার অন্তরে? তুমি অপচয় করো না, শুধুমাত্র সামাজিক কারণে নয়— কারণ আল্লাহ এটা পছন্দ করেন না।

সবশেষে দোয়া করি:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ

হে আল্লাহ, আমি তোমার ভালোবাসা PvB , এবং যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা চাই , এবং যে কাজগুলো তোমার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যায়, তা চাই।

আল্লাহ বললেন: *তুমি সৎ থাকো, যেমনটা তোমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তোমার সাথে তাওবা করেছে তারাও যেন সৎ থাকে, আর সীমালঙ্ঘন করো না। (সূরা হূদ)*

এই আয়াতের কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ এতে বলা হয়েছে: সৎ থাকো, যেমন আদেশ করা হয়েছে।

সৎ থাকা মানে হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। আমি কেন সৎ হবো? কারণ তিনি চান আমি সৎ থাকি। কোরআনে দুইবার বলা হয়েছে, যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ, এরপর সৎভাবে চলেছে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর ফেরেশতা তাদের ওপর অবতরণ করে বলে: ভয় পেয়ো না, দুঃখ করো না, এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।

আমি সবসময় প্রশ্নকে উল্টে ভাবি যেন বুঝতে পারি—আমি কেন সৎ নই? কেন আমি দুর্বল হয়ে পড়ি লোভনীয় বিষয়গুলোর সামনে? চিন্তা করো । হয় আমি লোভনীয় বিষয় দিয়ে ঘেরা, বা আমি নিজেই তা নিয়ে এসেছি।

আমাদের কাছে এখন কী কী লোভনীয় বিষয় আছে? মোবাইল!

মোবাইল একা কোনো সমস্যা না। এটা আল্লাহর দান, যেন আমাদের জীবন সহজ হয়। আমার ৯০% কাজ হয় মোবাইলের মাধ্যমে—ইমেইল, মেসেজ, ক্লাস। কিন্তু আমি একে সমস্যায় পরিণত করেছি। কীভাবে? যখন এর মধ্যে টিকটক , ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি আসে—আর আমি দেখছি এগুলো আমাকে প্রভাবিত করছে, তখন বুঝতে হবে, আমাকে এটা বাদ দিতে হবে।

তুমি কি ভাবছো কেউ তোমার মাথায় বন্দুক ধরে রেখেছে আর বলছে তোমার অবশ্যই টিকটক ডাউনলোড করতে হবে আর নাহলে মারা যাবে নাকি তোমার দ্বীন বলছে টিকটক ডাউনলোড করো এটা ওপেন করো। এগুলো হওয়ার কারন তোমার নফস নাম্বার ১ আছে।

তুমি যদি কোনো জিনিস ভালোবাসো, আর সেটা তোমাকে আল্লাহর থেকে দূরে নিয়ে যায়—তা সঙ্গে সঙ্গে বাদ দাও। বলো না 'আমি এটা ছাড়া বাঁচতে পারব না'।

উদাহরণ: আমি বাজারে গেলে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফেলি। উত্তর: তাহলে বাজারে যেও না। বন্ধুরা বলল: চলো বাইরে কফি খেতে। 'না' বলার ক্ষমতা রাখো।

সৎ থাকা শুরু করা কঠিন না, কঠিন হলো ধরে রাখা। আল্লাহ বলেছেন: যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ', তারপর সৎভাবে চলে।

রাসূল (সা.) বলেছিলেন: 'যখন তুমি আল্লাহকে চিনবে, তখন আঁকড়ে ধরো।' আমি যদি বুঝি ফেসবুক আমার ওপর প্রভাব ফেলছে আমার সালাত I আমার আত্মাকে প্রভাবিত করছে—তাহলে এটা বাদ দাও এবং সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকো।

আমাদের ওপর লোভনীয় জিনিস বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ৮০-৯০% আমরা নিজেরাই এনেছি। এমনকি কাজেও যদি কিছু হয়, আমরা সীমা নির্ধারণ করতে পারি। দায়িত্ব অন্যের নয়। আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, কে তোমাকে মোবাইল দিয়েছে? বরং জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কী করেছিলে?

তাই সৎ থাকার মানে হচ্ছে—লোভনীয় জিনিসগুলো সরিয়ে দেওয়া।

যখন আল্লাহ্ আমাকে কোনো নিয়ামত দেন এবং আমি তা এমনভাবে ব্যবহার করি না যা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে, তখন এই নিয়ামত আমার কাছ থেকে তুলে নেওয়া হয়। তাই, আমাকে এগুলোi 'প্রলোভন' থেকে রক্ষা করতে হবে।

এখনকার সময়ে, সমস্ত কিছুই সহজলভ্য, যদিও সস্তা নয়, তবুও সবকিছু পাওয়া যায়। সুতরাং, আমাকে আমার অন্তরকে রক্ষা করতে হবে। আমি বলি, হে আমার অন্তর, আল্লাহ্ তোমার সহায় হোন। এই অন্তরকে রক্ষা করো। সবকিছু তোমার থাকতে হবে এমন নয়, অন্যদের যা আছে, তা তোমারও থাকতে হবে এমন নয়। কিন্তু এর জন্য চাই—তোমার অন্তর কোথায় আছে?

এটি অন্তর ছাড়া সম্ভব নয়, কারণ এটি সত্যিই কঠিন। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তোমার অন্তরে থাকেন, সত্যিকারভাবে, তবে তুমি আশাবাদী হতে পারো।

আমরা অনেকেই যারা অবিবাহিত আমরা সচরাচর বলি। আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু মানুষের অবস্থা দেখে ভয় লাগে। কিছুদিন আগে, ভারতের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তালাক দিয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির ছোট ছেলে বিয়ে করলেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করলেন, আজ তারা আলাদা হয়ে গেছেন।

মানুষের পরিস্থিতি দেখে আমি ভয় পাই—তালাকের ভয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝেও এখন তালাকের হার অমুসলিমদের সমান হয়ে গেছে।

মানুষ কী করে, তা আমার উপর প্রযোজ্য নয়। আমি যদি বিয়েকে ইবাদত হিসেবে দেখি, তাহলে কিভাবে আমি তা থেকে পালাতে পারি? যদি আমি তা সুন্নত হিসেবে দেখি, তবুও কিভাবে আমি সুন্নত থেকে মুখ ফিরাই? হয়তো আমি বিয়ে করব না, কিন্তু আমি যেন এমনটি না বলি যে 'আমি বিয়ে করব না, কারণ মানুষের অবস্থা খারাপ।' বা 'আমি বিয়ে করব, কারণ সবাই বিয়ে করেছে।' না, বরং আমি বলি, হে আল্লাহ্, তুমি আমার সহায় হও, আমি বিয়েতে নিয়ত খালিস করি তোমার জন্য এবং আমি তোমার উপর ভরসা করি। আমি চলবো সেই হাদিস অনুযায়ী—"যে ব্যক্তি তোমার কাছে দ্বীন এবং চরিত্রে সন্তোষজনক, সে এলে বিয়ে দাও।"

এখানে নবী (সা.) দ্বীন ও চরিত্র আলাদা করেছেন, কারণ সব সময় একজন ধার্মিক ব্যক্তি ভালো চরিত্রের হয় না, আর ভালো চরিত্রের মানুষ সব সময় ধার্মিকও হয় না। দুটিই দরকার।

আমি মানুষের অবস্থার চিন্তা করব না। আমি কেয়ামতের দিনে একা দাঁড়াব আল্লাহ্র সামনে। আমি চাই না, আল্লাহ্ আমাকে প্রশ্ন করুন, তুমি কেন বিয়ে করোনি? আর আমি বলি, মানুষের অবস্থা দেখে ভয় পেয়েছিলাম।' তুমি মানুষকে ভয় পাও? আল্লাহ্কে না? আমি বলব, হে আল্লাহ্, আমি তোমার সব আদেশ পালন করেছি, কিন্তু আমার কাছে এমন কেউ আসেনি যার দ্বীন ও চরিত্র আমাকে সন্তুষ্ট করেছে, তাই আমি বিয়ে করিনি। শেষ। এটিই কদরের সিদ্ধান্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছিলেন:

আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই, তখন আমি তা দেখতে পাই আমার স্ত্রীর আচরণে, আমার বাহনের আচরণে এবং আমার খাদেমের আচরণে।

অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্যতা করলে আমি এর ফল দেখতে পাই। যেমন, আমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আর চালক বাসায় নেই—সে পালিয়ে গেছে।

আমি দোষ চাপাব না চালকের ওপর, বরং আমি প্রথমে নিজেকে বলব, হে আমার রব, আমি কী করেছি?

গত রাতে কী দেখেছি? কী বলেছি? কী শুনেছি? তুমি আর তোমার স্বামীর মধ্যে বড় সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ অনুমতি না দিলে তো তা হতো না।

আমি বলি না যে আমার স্বামী খারাপ, তার মা এমন, তার বোন তেমন...

প্রথম প্রশ্ন হবে, আমি কী করেছি যার কারণে আল্লাহ এই ব্যাপারটি ঘটতে দিলেন? এটাই হচ্ছে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উপায়—তাওবা করে নিজে সংশোধন হও। যদি তুমি সত্যিই আল্লাহর কাছে যেত চাও, তাহলে গুনাহ ত্যাগ করো। গুনাহ আমাদের কাছে সাধারণ হয়ে গেছে। গীবত ও চোগলখোরি আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এমনকি আমার অন্তরও এখন আর এর বিরোধিতা করে না, আমার মধ্যে সাহস নেই কাউকে বলার, "এটা গীবত, এটা চোগলখোরি।"

আল্লাহ বলেছেন:

তোমাদের কেউ কি চায় নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে? এই আয়াত সবাই জানে| তবুও যখন আমরা কথা বলি বা শুনি, তখন আয়াত মনে পড়ে না।

আল্লাহ বলেছেন, তাদেরকে তাদের গুনাহর কারণে ধ্বংস করেছি।

ফিরআউন এবং মূসার কওমের ব্যাপারে বারবার বলা হয়েছে—তাদের গুনাহর কারণেই ধ্বংস করা হয়েছে। গুনাহর ফলাফল আছে।

আল্লাহর পথে স্থির থাকো, ফিতনার সামনে নিজেকে ধরে রাখো।

এই কবিতাটি মনে রাখো:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا، فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ

নিজেকে আগে সংশোধন করো, নিজেকে *ভুল থেকে বিরত রাখো। যখন তুমি নিজেকে সংশোধন করতে পারবে, তখন তুমি হেকমতের অধিকারী হবে।*